সামনে আড়ালে

যোগব্রত চক্রবর্তী

প্রিয়বরেষু

বলুন তো আলোতে কী দেখা যায় না? বলুন, বলুন, একমাত্র কোন জিনিস আলোতে দেখা যায় না?

আমি রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। বেণী দুলিয়ে, কচি মাথা ঝাঁকিয়ে রেবা বলল, বলুন বলুন, বলতে পারছেন না?

আমি মাথা চুলকে বললুম, না তো!

—ভাবুন একটু। কী, পারবেন না ঠিক? অন্ধকার! আলোতে অন্ধকার দেখা যায় না। নাঃ, আপনি কিচ্ছু জানেন না।

রেবা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। শুধু আমি কেন, ঘরে আরো দু'তিনজন ছিল, রেবার ধাঁধার জবাব কেউই তো দিতে পারেনি।

রেবা আমার বন্ধু নীতিশের বোন। দশ-এগারো বছর বয়েস থেকে ওকে দেখছি, ভারী সুন্দর ছটফটে মেয়ে রেবা। আমরা নীতিশদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে আড্ডা দিচ্ছি বা তাস খেলছি, রেবা হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকে আমাদের এক-একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করত। ওর মুখ-চোখ দেখে মনে হতো, এইমাত্র ও নিজেই ধাঁধাটা বানালো—এবং এখুনি ও কারুকে পরীক্ষা করতে চায়। বেশির ভাগ ধাঁধাই রেবার নিজস্ব, আমি আগে অন্য কারুর মুখে শুনিনি। আরেকবার ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বলুন তো, ভগবানকে সব সময় কোথায় পাওয়া যায়?

আমি বলেছিলুম, এ আবার একটা ধাঁধা নাকি? ভগবান সারা পৃথিবীতেই সব সময় ছড়িয়ে থাকেন, শুনেছি।

—নাঃ, তা নয়! কোথায় আপনি সব সময়ই ইচ্ছে করলে দেখতে পাবেন?

—এটা বড়ো শক্ত, রেবা। এটা আমি পারব না।

রেবা খিলখিল করে হেসে বললে, কী যে আপনি, মোটেই মাথা ঘামাতে চান না। একটু ভাবুন, এটা খুব সহজ।

আমি একটুক্ষণ মাথা চুলকে বললুম, কোথায় সব সময় ভগবানকে দেখতে পাব? উঁহু, এটা খুব শক্ত, আমি কিছুতেই পারব না।

—পারলেন না? ডিকশনারিতে! যে কোনো ডিকশনারির মধ্যেই ভগবান পাবেন।

তখন রেবার বয়েস পনেরো-ষোল হবে। ছেলেবেলা থেকেই ওকে দেখছি,

তাই ওর বড়ো হয়ে ওঠাটা মনে থাকে না। ওকে ছেলেমানুষই মনে হয়। আমি হয়তো রেবাকে দেখে একদিন বললুম, কী রেবা, এবার কোন ক্লাস হলো ? তোমার স্কুল-ফাইন্যাল কোন বছর ?

রেবা বলল, বাঃ, জানেন না বুঝি ! আমি তো এখন কলেজে পড়ি, সেকেন্ড ইয়ার আমার।

আমি চমকে গেলুম। সত্যি তো, সময় বেশ তাড়াতাড়ি কেটে গেছে। রেবা এখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি, বিনুনির তলায় আর লাল রিবনের ফুল বাঁধে না। দিব্যি একটা কলেজের মেয়ের মতনই তো দেখাচ্ছে। অথচ, এতদিন একেবারেই লক্ষ্য করিনি। সেদিনও রেবা একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছিল। দু'একটা কথার পরই আমায় জিজ্ঞেস করল, নীলুদা, বলুন তো বাটা বানান কি ?

আমি সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এর মধ্যে আবার কিছু চালাকি আছে বুঝি ? এ বানান তো সবাই জানে!

রেবা হাসি চেপে বলল, বলুন না! ভয় পাচ্ছেন কেন ?

—বাংলায় ?

—ইংরিজিতে।

আমি তখনো অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চেয়ে থেকে বললুম, বাটা বানান বি এ টি এ। কেন ?

রেবা গম্ভীর মুখ করে বলল, হয়ে গেছে ?

আমি বললুম, হ্যাঁ।

—সত্যি ?

আমি এমন গোবর গণেশ ধরনের যে তখনো ধাঁধার সে ইয়ার্কিটা ধরতে পারিনি। রেবা রাস্তার ওপরই দাঁড়িয়ে হাসিতে ভেঙে পড়ে বলল, ওমা, আপনার বিয়ে টিয়ে হয়ে গেছে ? কবে হলো ? আমরা নেমন্তন্নই পেলুম না! দাঁড়ান, মাকে বলছি—

আমি দেখলুম, রেবা এখন কলেজের মেয়ে হলে কি হয়, সেই রকমই ছেলেমানুষ আছে। আমি ওর পিঠে একটা কিল মেরে বললুম, গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি না ?

রেবা ঠোঁট উল্টে বলল, ইস, ভারী গুরুজন!

তারপর নীতিশ চলে গেল পশ্চিম জার্মানিতে। এক বছরের নাম করে গিয়ে আর ফিরল না। নীতিশের বাড়ির আড্ডাটা আমাদের উঠে গেল। রেবার সঙ্গেও আর দেখা হয় না। ক্বচিৎ হয়তো পথে-টথে দেখা হয়ে যায়। একবার গড়িয়াহাটার মোড়ে দেখা হলো, আরো তিন-চারটি রঙিন মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। আমি

হাসিহাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করলুম, কি, ভালো আছ?

রেবা দল ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, উঃ কদ্দিন বাদে দেখা। আর আসেন না কেন আমাদের বাড়িতে?

আমি বললুম, যাব একদিন, মা ভালো আছেন তো? তোমার এবার ফোর্থ ইয়ার, না? কি অনার্স নিলে?

রেবা বলল, আপনার কিছু মনে থাকে না। কতদিন কেটে গেছে তা খেয়াল আছে? আমি এখন সিকসথ ইয়ারে পড়ি, এ বছর ফিলজফিতে এম. এ. দেব।

সত্যি তা হলে অনেকদিন কেটে গেছে। রেবা তা হলে এখন আর মেয়ে নয়, নারী যাকে বলে। মেয়েরা বোধহয় সময়ের চেয়েও আগে এগিয়ে যায়। গত ছ'সাত বছরে আমি যত বড়ো হয়েছি, রেবা তার চেয়েও অনেক বেশি বড়ো হয়ে গেছে মনে হয়। সেই রকমই ঝলমলে মুখ, শিশুর মতন চাহনি, অথচ এরই মধ্যে এম. এ. পড়ে? ভোজবাজী নাকি?

রেবা বলল, আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন? চলুন, আমাকে এগিয়ে দেবেন বাড়ি পর্যন্ত। আমি রাজি হলুম।

রেবার কিন্তু সেই ধাঁধা জিজ্ঞেস করা স্বভাব তখনো যায়নি। একটু দূর হাঁটতে-না-হাঁটতেই আমাকে একটি কঠিন ধাঁধা জিজ্ঞেস করে বসল, একটি ওজন-যন্ত্রে তিনখানা মাত্র বাটখারা দিয়ে তেইশ সের কি করে মাপা যায়— এই ধরনের জটিল অঙ্ক। আমি বললাম, তুমি পাগল হয়েছ? একেই ধাঁধা-টাধা আমার মাথায় ঢোকে না, তার ওপর আবার অঙ্ক! ছি! সবাইকে সব ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে নেই।

রেবা হাসতে হাসতে বলল, আচ্ছা, এইটা বলুন। খুব সোজা। আপনাকে তিনটে বানান জিজ্ঞেস করব, খুব চটপট উত্তর দিতে হবে? পারবেন?

—বাংলা না ইংরিজি? ইংরিজি হলে ভয় আছে, বাংলা হলে পারতেও পারি।

—বাংলা। খুব সোজা। তিনটে বানান জিজ্ঞেস করব, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে হবে। বলুন, পিপীলিকা।

আমি বললুম, প্রথমটা হ্রস্ব-ই, তার পরেরটা হবে দীর্ঘ-ঈ, আবার হ্রস্ব-ই।

—পরিণাম?

—র-এ হ্রস্বই। মূর্ধন্য-এ আকার।

—উঁহু।

—কী, হয়নি? কি বলছ তুমি?

—আবার বলুন, গোড়া থেকে, তাড়াতাড়ি বলুন পিপীলিকা? আমি বললুম।

—পরিণাম!

একটু ভেবে আমি আগের বারের মতো বললুম। রেবা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,

উঁহু। আমি বেশ ছদ্ম ক্রোধের সঙ্গে বললুম, পরিণামে তুমি বলতে চাও দন্তের ন ? মোটেই না, তোমাদের ক্লাসে বুঝি আজকাল এই রকম বানান শেখানো হয় ? স্পষ্ট নত্ব-বিধান—

রেবা কুলকুল করে হাসতে হাসতে বলল, আপনি যে কি ছেলেমানুষ ? পরিণাম বানান ভুল কে বলেছে ? কিন্তু উঁহু কথাটার বানান কে বলবে ? আমি তিনটে বানান জিজ্ঞেস করব বলেছিলুম, পিপীলিকা পরিণাম আর উঁহু! পারলেন না তো!

রেবা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগল। আমি বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম। রেবাকেও আমি এই একবার ঠকিয়েছি। এই ধাঁধাটা আমি আগে থেকেই জানতুম। তবু ইচ্ছে করে বলিনি! ধাঁধা জিজ্ঞেস করে ঠকাতে পারলে যে-রকম উজ্জ্বল ভাবে হাসে, তা দেখতে আমার ভারী ভালো লাগে। ধাঁধার উত্তর দিয়ে কি লাভ হতো ? কিছুই না। কিন্তু ঠিক উত্তর না দিয়ে আমি ওর মধুর হাস্যময় মুখখানি দেখতে লাগলুম।

তারপর আবার অনেকদিন রেবার সঙ্গে দেখা হয়নি। মাঝখানে কার মুখে যেন শুনেছিলাম রেবার বিয়ে হয়ে গেছে বেশ রোমহর্ষক ভাবে। বাড়ির অমতে, বাড়ি থেকে চলে গিয়ে রেবা বিয়ে করেছে ওর গানের মাস্টারমশাইকে। তার সঙ্গে রেবাদের জাত মেলে না, সামাজিক অবস্থা মেলে না, বয়সে মেলে না—লোকটি প্রায় প্রৌঢ়, রেবা তবু তাঁকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। খবরটা শুনে আমি ভেবেছিলুম, রেবার স্বামী খুব ভাগ্যবান— কারণ রেবার মতন এমন সরল প্রাণবন্ত মেয়ে খুব কম দেখা যায়।

তারপর কাল দুপুরে আমার রেবার সঙ্গে দেখা হলো। এসপ্লানেড ট্রাম গুমটির কাছে দারুণ রোদ্দুরে একটা হলদে শাড়ি পড়ে রেবা দাঁড়িয়েছিল। আমি দূর থেকেই চিনতে পেরেছি। চুপি চুপি পিছন দিক থেকে এসে আমি ওর কানের কাছে মুখ দিয়ে বললুম, এই খুকী!

দারুণ চমকে রেবা মুখ ফেরাল। মুখখানা একটু শুকনো। তবু হাসি ফুটিয়ে বলল, ওমা, আপনি! কতদিন দেখা হয়নি।

আমি বললুম, খুব তো নিজেই এবার বিয়ে সেরে ফেললে, আমাদের নেমন্তন্নও করলে না।

ও বলল, আপনার পাত্তাই পাওয়া যায় না! প্রায়ই তো কলকাতার বাইরে, দেশের বাইরে থাকেন শুনেছি—

—এখন তো আছি। কোথায় বাড়ি তোমার ? একদিন নেমন্তন্ন করো, তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করি, গান শুনি।

—আমি তো বাড়িতে থাকি না। আমি একটা কলেজে পড়াই আর মেয়েদের হোস্টেলে আলাদা থাকি।

—আর তোমার স্বামী?

—তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।

—কেন? এই তো দু'এক বছর মাত্র বিয়ে হলো।

—বিয়ের কয়েক মাস পরে জানতে পারলুম, ওঁর আর একজন স্ত্রী আছে। পাঁচ-ছ বছর ধরে ওঁকে চিনি, কিন্তু কোনোদিন একথা জানাননি।

—সে কি! এ তো দারুণ বে-আইনী ব্যাপার। কেস করলে ওর লম্বা জেল হবে।

—আমি সেসব কিছু চাই না। ও কথা থাক।

এরপর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আর কী কথা বলব ভেবে পেলুম না। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। এখন ট্রাম এলে রেবা উঠে পড়লেই ভালো হয়। এখন রেবার মুখের দিকে তাকাতেই পারছি না আমি, পৃথিবীর সমস্ত গানের মাস্টারদের প্রতি রাগে আমার শরীর জ্বলতে লাগল।

একটুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর রেবা আস্তে আস্তে বলল, নীলুদা, কোনো মানুষকে যদি কেউ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে, তবু সে সেই বিশ্বাসের মূল্য দেয় না কেন বলতে পারেন?

আমি ধীরস্বরে বললুম, রেবা, আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানি না।

রেবা মাটির দিকে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি রেবার যাযাব উত্তর দিতে পারলুম না, তবু এই প্রথম রেবা নিজে খিল-খিল করে হেসে উঠতে পারল না।

২

বাস শুদ্ধ সব লোক হেসে উঠল হো-হো করে। উচ্চ হাস্য, হাসির ঢেউ, একজনের হাসি গড়িয়ে যাচ্ছে অন্যের মুখে।

অফিস যাবার সময় কেউ আবার হাসে নাকি কলকাতা শহরে? সকলেই মনে মনে কাঁদে অথবা প্রকাশ্যে ক্রুদ্ধ, কপালে ঘাম, চার দিকে মানুষের দেয়াল। অফিস যাবার সময় মাত্র দুটি জিনিস মনে থাকে, যে-কোনো বাস বা ট্রামের একটা হ্যান্ডেল ছোঁয়ার সামান্য অধিকার আর অফিসের হাজিরা খাতায় লাল পেন্সিলের দাগ। বাড়িতে স্ত্রীর কপালে সিঁথির সিঁদুর মুছে যাক ক্ষতি নেই, তবু অফিসের খাতায় যেন লাল দাগ না পড়ে। আমি একেবারে বাসের মাঝখানে, জমাট ভিড়ের

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ছিলুম, হাসির কারণটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। এ ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে ঝগড়া করবে, অথবা উচ্চকণ্ঠে তেতো রাজনীতি অথবা লেডিস সিটের সামনে বেশি ভিড় কেন—এই নিয়ে প্রাকৃত আলোচনা—এই তো সকাল সাড়ে ন'টার ট্রাম-বাসে স্বাভাবিক নিয়ম, হঠাৎ নিয়ম ভেঙে এই প্রবল গ্রীষ্মে বসন্তের এক ঝলক হাওয়ার মতো কী করে এল হাসির ঢেউ? বাস থেমে আছে। সম্ভবত ট্রাফিক পুলিশের কর-রেখা এখন বিচার করছে ড্রাইভার। আমি ছটফটিয়ে উঠে এদিক-ওদিকে মাথা ঘুরিয়ে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করতে লাগলুম, কি হয়েছে? কী হয়েছে? সবাই হাসিতে ব্যস্ত, কেউ উত্তর দিচ্ছে না। আমি পাশের দৈত্যাকার লোকটিকে অনুনয় করলুম, আমায় একটু দেখতে দিন না। আমিও একটু হাসতে চাই। লোকটির ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আশপাশের সকলের মাথা ডিঙিয়ে প্রায় জানলার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খ্যা-খ্যা করে হাসছে। আর বলছে উঠে পড়ুন, উঠে পুড়ুন, ওদের উঠতে দিন!— সঙ্গে সঙ্গে সকলের আবার হাসির হুল্লোড়।

আমি বেপরোয়া হয়ে, কী অসম্ভব উপায়ে কে জানে, ঠেলেঠুলে জানলার কাছে চলে এলুম। এসে যা দেখলুম, তাতে চোখ জুড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের দু'পাশে এল স্মিত হাস্য। একজোড়া টাটকা নবদম্পতি বাসে ওঠার চেষ্টা করছে।

দমদম থেকে বাস আসছে কলকাতায়। বিদেশ থেকে অনেক টুরিস্ট এসে গাইডদের সঙ্গে নিয়ে দমদমের বাসের ছবি তুলে নিয়ে যায়—কলকাতার বাসে কতটা ভিড় হয় তার প্রমাণ হিসেবে। সেই বাসে, অফিসের সময় উঠতে এসেছে নবদম্পতি। হাসবে না লোকে?

বরের চেহারা রোগা, কালো, বছর তিরিশেক বয়েস, মুখময় পাউডার, গায়ে ঝলঝলে সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে টোপর। সে অনুনয় করে বলছে, একটু উঠতে দিন না। বিশেষ দরকার!

আর সেই কথা শুনে পা-দানির ওপর থিকথিক-করা লোকগুলো, যারা জানলা ধরে ঝুলছে, যারা মাডগার্ডে বসে আছে, যারা কিছুই না ধরে চুম্বকের মতো স্রেফ বাসের গায়ে লেগে আছে, তারা সবাই অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে বলছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন! উঠতে দিন না! কনডাকটার হাসছে, গাড়ি থামিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভারও হাসছে।

বরের পাশে নতমুখী বধূ। তখনো লাল চেলী পরনে, গলায় বাসি ফুলের মালা, নিশ্চয়ই চোখে জল। আমি মেয়েটির মুখ দেখতে পাইনি, চোখ দেখতে পাইনি, কিন্তু নিশ্চয়ই সেই ছোট্টখাট্টো মেয়েটি সুন্দরী, অন্তত বিয়ের দু'তিন দিন কোন মেয়ে সুন্দরী নয়? ওদের সঙ্গে আরো দু'তিনজন লোক দাঁড়িয়ে, একজনের হাতে ফুল আঁকা টিনের সুটকেস।

বরকে দেখে মনে হয় কোনো কারখানার ভদ্র মজুর। কী এমন ওদের জরুরি দরকার কে জানে, যে বাসি বিয়ের দিনে এমন সময়েই ফিরতে হবে। ছেলেটিকে কি বিকেলের সিফট-এ যেতে হবে কারখানায়? কিংবা অন্য কিছু ব্যস্ততা। কিন্তু বিয়ের পরদিন বর-বউয়ের প্রথম একসঙ্গে যাত্রা, তাও এই ভিড়ের বাসে? ওরা পাগল নাকি! অবশ্য, যদি যেতেই হয়, কী করেই বা ওরা যাবে। বর-বউ হেঁটে যাচ্ছে, এ দৃশ্য আরো হাস্যকর। হয়তো ট্যাক্সি করা ওদের পক্ষে কল্পনাতীত বিলাসিতা, কিন্তু জীবনে এই একবারও কি বিলাসিতা চলে না! অবশ্য, তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ল, এই সময় কোনো ট্যাক্সি পাওয়ার চেয়ে একটা মোটর গাড়ি কেনা অনেক সহজ।

হাসছিলুম আমিও, কিন্তু ভিতরে একটা গভীর দুঃখবোধও জেগে উঠেছিল। এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে, সকাল সাড়ে ন'টায় বাসে একটি সদ্যবিবাহিত দম্পতিকে ঠেলে ঠুলে ওঠার চেষ্টা করতে দেখব—কোনোদিন ভাবিনি। আমি জানতুম, যত অকিঞ্চিৎকরই হোক, যে কোনো বঙ্গ-যুবকই বিয়ের দু'তিনটি দিনের রাজা। অথচ এই বর্বর বরটা আজও বরযাত্রীদের মধ্যে উঠে দুশো জনের একজন হতে চাইছে! রাস্তা দিয়ে কত মোটর গাড়িও তো যাচ্ছে, কেউ তো হুস করে হঠাৎ থামিয়ে ওদের বলতে পারত, চলো, আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসছি। থাক, ওরা ঘোর দুপুর পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক, ততক্ষণ রাস্তার মজাখোর জনতা ওদের দেখে হাসুক!

বাস একটু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ ধরে রস উপভোগ করার ধৈর্য সবারই নেই। দুমদুম করে টিনের গায়ে আওয়াজ হলো, একজন চেঁচিয়ে উঠল, চলুন, আর নয়! অফিসে লেট হয়ে যাবে দাদা এই বর-বউ দেখতে দেখতে। রোগা চেহারার বরটি তখনো ওঠার নিষ্ফল চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বাস স্টার্ট নেবার শব্দ, বিশ্রী ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। খুব আস্তে চলতে শুরু করল, আরো বিশ্রী ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, স্পীড নিল না। আবার ঘটাং ঘট আওয়াজ, আস্তে আস্তে চলতে চলতে দু' পা গিয়েই বাস থেমে গেল। সবাই চেঁচিয়ে উঠল, কী হলো। কী হলো!

বাস থেমেই রইল, বেশ কিছুক্ষণ আরো বিদঘুটে ঘট ঘটাং আওয়াজ; তারপর ড্রাইভারের উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ব্রেক ডাউন, নেবে পড়ুন, বাস আর যাবে না!

একটু আগে ছিল হাসির ঢেউ, কিন্তু এখন ক্রুদ্ধ কলরোল। অবশ্য একথা সবাই জানে, একবার 'ব্রেক ডাউন' বললে, সে বাসে থেকে আর কোনো লাভ নেই। প্রবল চিৎকার করতে করতে সবাই নেমে যেতে লাগল, কে যেন বলে

উঠল, কী অপয়া বর-বউ দেখলুম রে বাবা! দেখা মাত্র গাড়ি খারাপ!

এখন এসব লোক কী করে পরের বাসে উঠে যাবে, তা কল্পনা করা ঈশ্বরেব পক্ষেও শক্ত। আমার অফিস-টফিসের ব্যাপার নেই, অন্য একটা কাজে যাচ্ছিলুম, এখন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলুম, যাক, আজকের মতো ছুটি! অফিস যাবার সময়ে মাঝপথে বাসে ওঠা আমার পক্ষে অসম্ভব।

বর-বউ তখনো দাঁড়িয়ে, বহুলোক তাদের ঘিরে আছে, দুটি সঙ দেখছে যেন তারা—সত্যিই অফিস যাবার ঘণ্টায় প্রকাশ্য রাস্তায়, বর-বউ দেখা হাস্যকর ছাড়া আর কি! বউটির নিচু করা মুখ বুকের সঙ্গে মেশানো, নিশ্চয়ই চোখে জল।

আমার ইচ্ছে হলো, অযাচিতভাবেই বরকে গিয়ে ধমকে বলি, কী তোমার এমন জরুরি কাজ! যাও ফিরে যাও! অন্তত আর একটা বেলা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে জামাই আদর খাওগে। তা, নয়, নতুন বউকে এই রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে...হাতে আবার টোপরটিও ধরে রাখা হয়েছে।

আমাদের ভূতপূর্ব বাসের ড্রাইভারটি বুড়ো মতন, এদিকে এল, মুখে চাপা হাসি। ড্রাইভার এসে বলল ওদের, আপনারা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ! এখন কোনো গাড়িতে উঠতে পারবেন না। তারচেয়ে, যান আমার এই খাবাপ গাড়িতে উঠে বসে থাকুন!

মনে মনে আমি ড্রাইভারটিকে ধন্যবাদ জানালুম। বর টিনের সুটকেস নিয়ে ফাঁকা বাসের মধ্যে উঠে বসল লাজুক মুখে। সেই রকম নিচু মুখেই উঠে গেল ছোট্ট বউ আর তার সঙ্গে দু'তিনজন। লোকের চোখের আড়ালে গিয়ে যে ওরা বসতে পারল এতে খুশি হলুম আমি। যেন সমস্যাটা ছিল আমারই।

হঠাৎ দেখি বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। দারুণ চমকে তাকাল ভিড়েব লোকেরা। চলতে আরম্ভ করেই বাসটা দারুণ স্পীড নিয়েছে। দু'দরজার দুই কন্ডাকটার মুখ বাড়িয়ে, আর জানলা দিয়ে ড্রাইভার মুখ বাড়িযে চওড়া মুখে হাসছে। কয়েক সেকেন্ডের চমক, তারপরই ভিড়েব মধ্যে অট্টহাসি উঠল। সে হাসি আর থামতেই চায় না। এই লোকগুলি বোধহয় আজ আর অফিসেই যেতে পারবে না, তবু হাসছে হো-হো করে।

৩

আমাদের বাড়ির সামনে একটা আতা গাছ ছিল। একটা জমিদারবাড়ি এখন ফ্ল্যাটবাড়ি করা হয়েছে, কিন্তু বাগানে দু'একটা শৌখিনতার চিহ্ন এখনো থেকে

গেছে। আমাদের বাড়ি ছাড়া কলকাতা শহরে আমি আর দ্বিতীয় আতা গাছ দেখিনি।

গাছটা আমাদের ফ্ল্যাটের খুবই কাছে, দোতলা-সমান লম্বা, আমাদের দোতলা ফ্ল্যাটেব বারান্দা থেকে ওর পাতাগুলো পর্যন্ত ছোঁয়া যায়। ফিঙে, শালিক আর ইস্টকুটুম পাখি এসে বসে, মেটে সিঁদুর আব কালোয় মেশানো বড়ো সাইজের ইস্টকুটুম পাখিগুলো অন্য পাখিদের তাড়িয়ে দিয়ে আতায় ঠোক্কর দেয়। বিশেষ কিছু পায় না অবশ্য, এ গাছের আতাগুলো কেমন শুকনো-শুকনো, ছোট, ভেতরে সারপদার্থ কম। বাংলাদেশের জমিতে ভালো আতা গাছ হবার কথা নয়, তাই এ গাছটাব চেহারাই অন্য রকম, দেওঘর-মধুপুরে যেমন বহু ডালপালা-ছড়ানো জননী-চেহারার আতা গাছ দেখেছি, এটা মোটেই সেরকম নয়। কেমন যেন লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা, সদৃঢ় সরু হয়ে উঠে এসে, মাথার দুদিকে দুটি মাত্র ডাল বেরিয়েছে। যাই হোক, তবু তো আতা গাছ! বাড়িতে কেউ এলে আমি ডেকে ডেকে দেখাই। যেন ঐ গাছটা আমারই কীর্তি।

আমাদের ঠিক নীচেব ফ্ল্যাটেই একটি হিন্দুস্থানী পরিবার থাকেন, ভদ্রমহিলাটি কাশীর মেয়ে, বেশ চমৎকাব ভাঙা বাংলা শিখেছেন। কেন জানি না, তিনি ঐ আতা গাছটি দ'চক্ষে দেখতে পাবেন না। বলেন, হাথ, এ আবার আতা গাছ আছে নাকি? জাত নষ্ট! ধ্যাৎ ধ্যাৎ।

বাড়ির কেয়ার-টেকাবকে ডেকে তিনি প্রায়ই বলেন, গাছটা কেটে ফেলতে। ঘরের সামনে একটা গাছ, দেখতে ভালো না আছে। এটাকে কেটে দেও না।

মালিকের ভয়ে কেয়ার-টেকার কাটতে রাজি হয় না। আমরা বলি, ভাবীজী, গাছটা কাটবে কেন, থাক না। এত চেনা গাছের মধ্যে একটা আতা গাছ দেখতে বেশ ভালোই লাগে।

ভাবীজী বলেন, আতা কখনো দেখেননি নাকি? এটা গাছ না মুর্দা? ধ্যাৎ ধ্যাৎ!

বাড়িতে কোনো বন্ধুবান্ধব এলে প্রশ্ন করে, এটা কি গাছ রে?

আমি অন্যমনস্ক হবার ভান করে আলতো ভাবে বলি, আতা গাছ! তারা বলে, বাঃ, আতা গাছ এরকম হয় নাকি? এরকম লম্বা?

আমি প্রমাণ হিসাবে দ'একটা শুকনো আতা গাছের ডালে ঝুলছে দেখাই। কোনোটা আধখাওয়া কোনোটা শুকনো কাঠরঙা। সারা বছরই দ' একটা থাকে। ফ্ল্যাট বাড়িব গাছ—যে ইচ্ছে নিতে পারে, আমরা হাত বাড়িয়ে বা লাঠি দিয়ে অনায়াসেই আতাগুলো পেড়ে নিতে পারি, কিন্তু নিই-না, গাছটার জাতের প্রমাণ হিসেবে ফলগুলো গাছেই রেখে দিই। ওপাশের দিশি আমড়া গাছটার পাতা হয়, আবার পাতা ঝরে যায়, কিন্তু আতা গাছটা একটা রুক্ষ তেরিয়া ভাব নিয়ে সারা বছব এক রকম। পাখিরা, কেন জানি না, আমড়া গাছটার চেয়ে আতা গাছটাকেই

বেশি পছন্দ করে, একটা কাঠঠোকরা পাখি ঠুক্‌রে ঠুকরে ওটায় গর্ত করতে চায়।

ভাবীজী কাপড় টানাবার জন্য একটা লোহার তার টান করে বেঁধেছেন আতা গাছটা আর নিজের ঘরের জানলার সঙ্গে। তারটা এমন টান যে, আতা গাছটা সামান্য হেলে গেছে। আমি বলেছিলাম, ভাবীজী, গাছটাকে তুমি মেরে ফেলবে নাকি?

ভাবীজী বললেন, ধ্যুৎ ধ্যুৎ, এ গাছ না মুর্দা? জাত নষ্ট। আতা গাছ আপনি কি দেখেননি? আমাদের কাশীতে আতা গাছ আছে, ইয়া ইয়া আতা হচ্ছে। আর এটাতে কি হয়—আতা না মোমফালি?

আমি বলেছিলাম, গাছটা দেখতে তো ভালো। বেশ অন্যরকম—

একবার দেশে বেড়াতে গিয়ে ফিরে এসে ভাবীজী আমাদের জন্য অনেকগুলো আতা নিয়ে এলেন। বললেন, দেখুন, আতা কাকে বলছে। হ্যাঁ—এ হচ্ছে আসল আতা—

আমি হাসতে হাসতে বললুম, আমি কি আতা দেখিনি নাকি? আতা এমন কিছু ভালো লাগে না খেতে!

—খেয়েই দেখুন, এ হচ্ছে আসলি জিনিস। মিষ্টি কি, গুড়।

আমার ভাইবোনরা বলল, সত্যি কি বিরাট বিরাট আতাগুলো, টুসটুসে হয়ে পেকে ফেটে গেছে।

ভাবীজী ছেলেমানুষীর মুখে গর্ব ফুটিয়ে বললেন, যে-রকম গাছ সে-রকম তো ফল হোবে। আতা গাছ এই রকম চওড়া, অনেক ডাল হবে, এমন ফল হোবে কি মাটি থেকেই হাত দিয়ে পেড়ে নিতে পারবেন। আর এখানে এটা কি আছে? গাছ নাকি? হাথ—

আমি বললুম, শুধু ফল দেখেই গাছের বিচার করতে হবে? মনে করুন না, এটা শুধু গাছ, এমনই ভালো—

—তাহলে আতা গাছ কেন? এমনি গাছ বললেই হয়? আপনার বন্ধু-টন্ধু এলেই বলবেন কি, আতা গাছ, আতা গাছ—তারা ভাববে কি—আতা গাছ এই রকমই আছে, আতা গাছ এ রকমই দেখতে হয়! কেন, আমড়া গাছভি তো গাছ আছে, ওটা কেন দেখান না?

—আমড়া গাছ তো সবাই চেনে। ওটা আর দেখবার কি আছে? আতা গাছ তো কলকাতায় চট করে দেখতে পাওয়া যায় না—

সেবার আতা গাছটার ওপর ভাবীজীর রাগ যেন আরো বেড়ে গেল। সন্ধের দিকে তারটা ধরে এমনভাবে হ্যাঁচকা টান মারেন যে গাছটা দুলে দুলে ওঠে। কিন্তু বেশ শক্ত গাছ, কলকাতার মাটি তার অপরিচিত হলেও দৃঢ়ভাবে ধরে আছে।

সত্যিকারের ফল ফলাতে চায় না, কিন্তু প্রবলভাবে বেঁচে থাকতে চায়।

ভাবীজীর কিন্তু গাছপালার খুব শখ, নিজের ঘরের চারপাশে নানান ফুল গাছ লাগিয়েছেন, ওর হাতের গুণে অল্প দিনেই থরে থরে ফুল ফুটে উঠল। একটা পেপে গাছও দু'এক বছরের মধ্যে দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠে দিব্যি বড়ো বড়ো পেঁপে ফলতে লাগল। ভাবীজী আমার মাকে নিজের গাছের পেঁপে উপহার পাঠিয়ে দিলেন। কি খুশিতে ঝলমল তার মুখ। শুধু আতা গাছটার ওপরেই যত রাগ। গাছটাকে ধরে ঝাকাতে দেখে আমি এক একদিন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছি, ও ভাবীজী, গাছটাকে ও রকম করছেন কেন?

ভাবীজীও হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, ওটা মরে গেলে, এটাকে কেটে বাগানের বেড়া বানাবো।

তারপর একদিন রাত্তিরবেলা প্রচণ্ড ঝড় উঠল। সে কি ঝড়, বিশ্ব সেদিনই ধ্বংস হয়ে যাবে—এইরকম কাণ্ড, ভয়ংকর শো-শো আওয়াজ, ইলেকট্রিকের পোস্ট উল্টে গিয়ে সমস্ত তল্লাটটা অন্ধকার, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায়, পৃথিবী সত্যিই ভয় পেয়েছে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন, খাওয়া দাওয়ার পর ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে প্রায় সারা রাতই ঝড়ের গর্জন শুনলাম। ঝড়ের মাঝপথে বৃষ্টি নামল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আচ্ছন্ন তন্দ্রায় সেদিন মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সত্যিই একটা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। কি রকম মাথার ওপর একটা কংক্রিটের ছাদ ও নিশ্চিন্ত বিছানা পেয়ে গেছি ভাগ্যবলে। গাছের পাখিদের আজ কি অবস্থা। কাল সকালে কি আর একটাও পাখি বেঁচে থাকবে?

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের বাড়ির সামনের বাগানটির অবস্থা একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মতন। সারা বাগান লণ্ডভণ্ড, গেটের কাছটায় আমগাছের একটা ডাল ভেঙে পড়েছে ইলেকট্রিকের তারে, একটা লাইট পোস্ট কাৎ হয়ে আছে, বিফিউজি কলোনির খড়ের চালগুলো থেকে গাদাগাদা খড় উড়ে এসে ছড়িয়ে আছে যেখানে সেখানে।

আতা গাছটা কাৎ হয়ে আছে। বৃক্ষেরা নাকি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ, যেদিকে বাড়ি থাকে সেদিকে সাধারণত গাছ হেলে পড়ে না। আতা গাছটা আমাদের বারান্দার উল্টো দিকে অনেকখানি হেলে পড়েছে, অনেকগুলো শিকড় ছিঁড়ে উপড়ে এসেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ পড়ে যায়নি, কিছু শিকড় এখনো মাটি আঁকড়ে আছে—যেন গাছটা এখনো বাঁচতে চায়, বাঁচার তীব্র ইচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে ভূমিশয্যা নেয়নি। কেউ যদি গাছটাকে ঠেলে আবার সোজা করে দেয় ও হয়তো আবার বেঁচে উঠবে।

ভাবীজী শিশুর মতন আনন্দে বাগানময় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ওর বাগানের ছোট ছোট ফুল গাছ বা পেঁপে গাছটার কোনো ক্ষতি হয়নি। কাপড় টাঙ্গানো তারটা ধরে ভাবীজী বারবার হ্যাঁচকা টান মারতে লাগলেন। আতা গাছটা নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল, তবু প্রবল প্রতিরোধের চেষ্টা। আমার কেমন মনে হলো, গাছটা শারীরিক কষ্ট পাচ্ছে, যন্ত্রণায় শিউরে শিউরে উঠছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না, কাশীর মেয়ের গায়ে বেশ শক্তি, একবার তারটা ধরে খুব জোরে টান দিতেই আতা গাছটার শেষ শিকড়গুলো পটপট করে ছিঁড়ে ঝপাস করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। ভাবীজী আনন্দে হাততালি দিলেন।

ভূপাতিত বৃক্ষ কি আমি আগে দেখিনি ? কিন্তু সেদিনকার সেই দেখার তুলনা হয় না। আগে, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে মাটিতে পড়ে থাকা গাছ দেখেছি। কিন্তু উঁচু থেকে, ওপরে দাঁড়িয়ে মাটিতে শুয়ে পড়া একটা গাছকে দেখার অনুভব অন্যরকম। গাছটার সমস্ত পাতা সবুজ, জীবন্ত শরীর, দেখলে মনে হয়, এইমাত্র মৃত্যু হলো। বিশাল লম্বা শরীর, মাথার কাছে দুটি মাত্র ডাল, হাতের মতন ছড়িয়ে অবিকল মানুষের মতন গাছটা যেন এইমাত্র অসহায়ভাবে মরে পড়ে গেল। বুঝি একটা শালিকের বাসা ছিল, দুটো শালিক পিড়িং পিড়িং শব্দ করে গোল হয়ে ঘুরছে মাথার কাছে, অবিলম্বে দুটো শান্ত চেহারার গরু গাছটার একেবারে ডগার দিকের কচি পাতাগুলো—গরুগুলো যা কোনোদিন ছুঁতে পাবার আশাই করেনি, এখন নির্বিকারভাবে ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে। দৃশ্যটা এমনই ট্রাজিক যে হঠাৎই আমার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল, বুঝি জল এসে যাবে।

গাছটাকে দেখে তখন আমার মানুষের মতনই মনে হয়েছিল। কোনো নিষ্ফল মানুষেরই মতন অসহায়ভাবে শুয়ে আছে। যেন কোনো মহাকাব্যের ট্রাজিক চরিত্র —মহাভারতের কর্ণ। পরের ঘরে মানুষ হয়ে যে সারাজিবন শুধু দুঃখই পেয়ে গেল।

৪

যেসব মানুষ একা ভয়ংকর পর্বত-শিখরে ওঠেন, যাঁরা দুঃসাহসে সমুদ্র সাঁতরে পার হন, তাঁদের কারুর সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি। অথচ খুব ইচ্ছে হয়। দেখা হলে একটা সামান্য প্রশ্ন করতুম। জিজ্ঞেস করতুম, এই যে দুঃসাহসের কৃতিত্ব স্থাপনের প্রয়াস, এর মধ্যে একটা উপকারী অহংকার আছে ঠিকই, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার অন্য একটি কৌতূহলের উত্তর দিন দয়া করে। সেই বিপদ

ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কোনো এক সময় কি আপনার জীবনের সব কথা এক সঙ্গে মনে পড়ে? আপনি জীবনে যা-যা ভুল করেছেন, তার জন্য ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে? আজ পৃথিবীতে মানুষ কোথাও আর স্বেচ্ছায় ক্ষমাপ্রার্থী নয়। কিন্তু যখন সে অত্যন্ত নির্জন, তুষার-ঝড়ের মধ্যে পাহাড়-শিখরে কিংবা হিংস্র জলজ জন্তু ও তরঙ্গসঙ্কুল মধ্য-সমুদ্রে, যখন প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুভয় তার নির্জনতাকে চরম করে, তখন একবারের জন্যও কি, জীবনের কোনো অপরাধ বা ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়?

অন্যসময় আজকাল আর কেউ ক্ষমা চায় না। পৃথিবীতে মানুষের যত ঝগড়া, পরস্পরের মনে দুঃখ দেওয়া—তার অধিকাংশই তো ভুল কারণে, ভুল বুঝে —একবার অকপট ক্ষমা প্রার্থনায় হয়তো সব মিটে যেত। খুব সামান্য দু'একটা ঘটনা উল্লেখ করি।

আমার পাশের বাড়িতে একদিন সকালবেলা তুমুল কোলাহল শুনতে পেলাম। যেন সে-সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহই নেই—এমন ভঙ্গি করে দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দায়, অথচ সেদিকেই কান ফেরানো আমার, চোখ বারবার সেদিক থেকে ঘুরে আসছে।

গণ্ডগোলটা পরেশকে নিয়ে। পরেশকে বেশ কিছুদিন ধরেই সন্দেহ করা হচ্ছিল, আজ সকালে সাড়ে তিনশো টাকা পাওয়া যাচ্ছে না—নিশ্চয়ই পরেশের কাজ। সত্যসিন্ধুবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, নিমোখারাম কোথাকার! জানি তো, মানুষের উপকার করলে আজকাল কোনো লাভ নেই, সবাই নিমোখারাম! দে টাকাটা বার করে দে, তারপর দূর হয়ে যা! নইলে তোকে আমি পুলিশে দেব!

পরেশের বয়েস উনিশ-কুড়ি, রোগা, লাজুক, কমার্স পড়ে, আমার সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে। পরেশ সত্যসিন্ধুবাবুর বাড়িতে আশ্রিত, গ্রাম সম্পর্কে না কি রকম যেন খুব দূরত্বের আত্মীয়তা আছে, অনাথ ও নিঃসম্বল বলে সে ওবাড়িতে থেকে পড়াশুনো করে। অর্থাৎ কিছুটা চাকরের কাজ, কিছুটা ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা—অনেক সচ্ছল বাড়িতেই এরকম দু'একটা ছেলে থাকে, যে বাড়ির ইলেকট্রিক খারাপ হলে সারাবার ব্যবস্থা করে, দুধের কার্ড করতে লাইনে দাঁড়ায়, গৃহিণীর জন্য ম্যাটিনির টিকিট কাটে, বাগবাজারের ঘাটে ইলিশ উঠেছে শুনে যাকে পাঠানো যায়, বাড়িসুদ্ধ সবাই বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলে যে বাড়ি পাহারা দেয় —পরেশও ঠিক সেইরকম, ঠিক চাকর নয়—কারণ মাইনে পায় না, খাওয়া ও পরার বিনিময়ে 'বাড়ির ছেলের মতো' থেকে কাজকর্ম করে।

পরেশকে আমি মোটামুটি ভালো ছেলে বলেই জানতুম, কিন্তু আজ ওবাড়ির কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, পরেশই চুরি করেছে। সত্যসিন্ধুবাবুর অফিসে যাবার

কোটের পকেটে টাকা ছিল, পরেশ তাঁর শোবার ঘরে আজ সকালে দু'বার ঢুকেছিল কেন? পরেশের উত্তর বড়ো নড়বড়ে, একবার খবরের কাগজ নিতে, আর একবার —ক'টা বেজেছে দেখার জন্য। কেন, একতলার বসবার ঘরেও তো ঘড়ি ছিল? ও ঘড়িটা খুব স্লো!

কাল অফিস থেকে ফিরতে রাত হয়েছিল, টাকাটা কোটের পকেটেই রেখেছিলেন, এই সকালের মধ্যে আর কে নেবে? রান্না করার ঠাকুর দোতলায় ওঠে না, ঠিকে ঝি আজ আসেইনি, নিজের ছেলেমেয়েরা তো নেবে না, আর নেবে কে, পরেশ ছাড়া?

মেজ মেয়ে ঊর্মিলা বলল, হ্যাঁ আমিও দেখলুম, ও তোমার ঘর থেকে বেরুচ্ছে সাড়ে আটটার সময়, আমাকে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল।

পরেশ শান্তভাবে বলল, আপনাকে আমি সব সময়ই ভয় করি।

সত্যসিন্ধুবাবু বললেন, টাকাটা বার কর! আজকাল রক্তের সম্পর্কের লোকদেরও বিশ্বাস নেই—তার এইসব বাজে...তখনই তোমাকে বলেছিলাম...দুধকলা দিয়ে...ওঁর স্ত্রী বললেন, আগে তো কোনোদিন খারাপ কিছু দেখিনি...নিজের ছেলেব মতো আদর-যত্নে রেখেও যদি...। পরেশ বারবার দৃঢ়স্বরে বলছে, সে টাকা নেয়নি। সত্যসিন্ধুবাবু হঠাৎ রাগের মাথায় পরেশের বাবা-মাকে জড়িয়ে একটা গালাগালি দিয়ে ফেললেন। পরেশ বলল, ওসব নোংরা কথা বলবেন না। আমরা গরীব ঠিকই কিন্তু...।

এরকম ঝগড়া কিছুক্ষণ গড়ালো। সত্যসিন্ধু·াবুর অফিসের বেলা হয়ে যায়। তিনি পরেশের গালে জোরে একটি চড় কষালেন, গৃহিণীর অনুরোধে তাকে আর পুলিশে দিলেন না—তদ্দণ্ডেই তাকে দূর হয়ে যেতে বললেন বাড়ি থেকে। একটা টিনের সুটকেশ আর রংজ্বলা সতরঞ্চির বিছানা নিয়ে পরেশ চলে গেল—যাবার সময় শুধু তিক্তস্বরে, একটু চেঁচিয়ে বলে গেল—পুলিশে দেবার উপায়ও ছিল না আপনার। যে টাকাটা আপনার হারিয়েছে, সে টাকাটা আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন তাও তো পুলিশকে বলতে হতো। ঘুষের টাকা।

দুদিন পর, সত্যসিন্ধুবাবুর ছোটছেলে আমাদের বাড়িতে লুডো খেলতে এসে ফিসফিস করে বলল, জানেন, পরেশদা চোর নয়। বাবা টাকাটা খুঁজে পেয়েছেন! — শুনে আমি শিউরে উঠলুম। টাকা যদি না নিয়ে থাকে তবে টিনের সুটকেশ আর বিছানা নিয়ে পরেশ কোথায় গেল? এই শহরে নিঃসম্বল অবস্থায় সে কি করবে? তার ওপর আবার ভুল অপমানের গ্লানি। ছেলেটা আত্মহত্যা করবে না তো।

কিন্তু পরেশের সঙ্গে আমার শিয়ালদা স্টেশনেই দেখা হয় গেল। সে স্টেশনে

রাত্রে শোয়, দিনের বেলা পোস্ট অফিসের সামনে বসে মনিঅর্ডার ফর্ম লিখে বারো আনা একটাকা উপার্জন করে। এখন আর কলেজে যাচ্ছে না, চোখে-মুখে তার একটা ভয়ংকর প্রতিজ্ঞার ছাপ পড়েছে।

একদিন সুযোগ পেয়ে সত্যসিন্ধুবাবুকে আমি একথাটা জানিয়ে দিলুম যে, পরেশ এখন শিয়ালদা স্টেশনে রাত্রে শোয়। সত্যসিন্ধুবাবু হঠাৎ বিব্রত মুখে বললেন, যাও, ওর ঐরকম শাস্তি হওয়াই উচিত। টাকাটা তুই নিসনি, তা বললেই পারতিস! তা নয় মুখে মুখে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! আমি ওর বাপের বয়েসী, এতদিন মানুষ করলুম, একটু শ্রদ্ধাভক্তি নেই! গেছে আপদ গেছে!

সত্যসিন্ধুবাবু এ-পাড়াতে বেশ একজন শ্রদ্ধেয় লোক। খুব বড়ো চাকরি করেন, সুদর্শন প্রৌঢ়, পাড়ার ক্লাবের তিনি সভাপতি, একটি স্কুলের সহ-সভাপতি, দুর্গাপুজোয় প্রচুর চাঁদা দেন। পরেশকে তিনি অন্যায় সন্দেহ করেছিলেন, এজন্য পরেশের কাছে যদি তিনি ক্ষমা চাইতেন—তাঁর গৌরবের একটুও হানি হতো না —কিন্তু পরেশের জীবনটা হয়তো বদলে যেত। তার বদলে পরেশ কোন ছন্নছাড়া জীবনে চলে গেল। একদিন হয়তো পরেশ এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে আসবে। কিংবা, সে না পারলেও পরেশের ছেলে হয়তো একদিন এসে প্রতিশোধ নেবে সত্যসিন্ধুবাবুর ছেলের ওপর। এইরকমই চলবে। তার বদলে, আমি কল্পনা করলুম, রাত্রি সাড়ে দশটায় সত্যসিন্ধুবাবু নিজের গাড়ি নিয়ে গেছেন শিয়ালদা স্টেশনে, ছেঁড়া সতরঞ্চি পেতে পরেশ শুয়ে আছে বিমর্ষ মুখে, হয়তো বিকেল থেকে কিছু খায়নি, চোখ দুটো থরথর করছে তার, এমন সময় তিনি যদি ওর মাথাব পাশে গিয়ে বলতেন—বাবা পরেশ, তোকে আমি ভুল ভেবেছিলাম, আমায় ক্ষমা কর! পরেশ নিশ্চয়ই তখন চমকে মুখ ফিরিয়ে থেকে, একটু পরে অভিমানে কেঁদে ফেলত। সেই মধুর দৃশ্যটি সম্ভব হতো, একটি মাত্র ক্ষমা প্রার্থনায়। কিন্তু, তা সম্ভব হবে না। কারণ, আজকাল কেউ ক্ষমা চাইতে জানে না।

আমিও পারিনি। জীবনে কত ভুল করেছি, কত মানুষের ওপর অন্যায় ব্যবহার করেছি, পরে মুখ ফুটে ক্ষমা চাইতে পারিনি। আমি ভেবেছি, ক্ষমা চাইলে যদি অনাধুনিক হয়ে যাই, যদি মনে হয় সেটা ন্যাকামি! কোথাও কেউ ক্ষমা চায় না —বাধ্য হয়ে বিপদে পড়ে বা ভয়ে ভয়ে ক্ষমা চাওয়া নয়, এমনিই স্বাভাবিক ভাবে হঠাৎ একদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিঃশর্তভাবে আর কেউ ক্ষমা চায় না। পৃথিবীর বহু বড়ো বড়ো ভুলের কথা জানি, কিন্তু আমার একটি সামান্য ভুলের কথা বারবার মনে পড়ে, আমি তার জন্যও ক্ষমা চাইতে পারিনি।

আমি এক মনোরম বিকেলবেলা এক বান্ধবীর সঙ্গে চৌরঙ্গি দিয়ে যাচ্ছিলুম। এমন সময় দূর থেকে একটি পরিচিত লোককে আসতে দেখতে পাই। এক ধরনের

পরিচিত লোক থাকে—যাদের সঙ্গে বারবার শুধু পথেই দেখা হয়। আমি তার বাড়ি চিনি না, সে আমার বাড়ি চেনে না, অথচ পথে পথে দেখা হয়— সারাজীবনই এইরকমই পরিচয় থেকে যায়। এই লোকটিও সেইরকম।

লোকটি অতিশয় ভালোমানুষ, দেখা হলেই কোনো রেস্টুরেন্টে বসতে চান, নিজে পয়সা খরচ করেন, পরিবর্তে কোনো উপকার চান না, কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলতে চান।

লোকটির সঙ্গে প্রায় মাস তিনেক পরে দেখা, কিন্তু সেই মুহূর্তে লোকটির সঙ্গে কথা বলার আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না। বান্ধবীর সঙ্গে সময় কাটাবার অতি লুব্ধতায় আমি লোকটিকে না-দেখার ভান করছিলুম। তবু লোকটি পিছন থেকে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, এই যে, কী খবর? আমি সাদামুখ করে বললুম, ভালো।

লোকটি তখনো উজ্জ্বল হাস্যে বললেন, তারপর সেদিন যে কথা ছিল—আমি তখনো নির্বিকারভাবে বললুম, কি কথা বলুন তো!

লোকটি একটু থতমত খেয়ে বললেন, কী চিনতে পারছেন না নাকি? আমি বললুম, হ্যাঁ মানে, ঠিক কোথায় আলাপ মনে পড়ছে না, তবে...

লোকটি বিবর্ণমুখে বললেন, আপনি আমায় চিনতে পারছেন না? আমি বললুম, হ্যাঁ, মুখ চেনা-চেনা লাগছে, তবে...। লোকটি আবার বললেন, আপনি আমায় চিনতে পারছেন না?—আমি তখনো মরীয়া হয়ে প্রচণ্ড ক্যাডের মতো বললুম, হ্যাঁ, তা, আপনার নামটা...।

লোকটির মুখ পাংশু হয়ে কুঁকড়ে গেল, মৃদুস্বরে বললেন, আচ্ছা থাক! তারপর হনহন করে চলে গেলেন।

আমার পাশে দাঁড়ানো বান্ধবী বললেন, ঐ লোকটির নাম তো অনিমেষ ভট্টাচার্য! তুমি চিনতে পারলে না? আমি বললুম, তুমি কি করে জানলে, তোমার চেনা? বান্ধবী হেসে বললেন, বাঃ, একদিন সেই যে আমরা চায়ের দোকানে বসেছিলাম, এই ভদ্রলোক এসে বসলেন, তুমি আলাপ করিয়ে দিলে, উনি খুব মজার মজার গল্প বলছিলেন, আমার মনে আছে, আর তোমার মনে নেই!

আমার সবই মনে ছিল, তবু কেন যে ওরকম ব্যবহার করলুম ওর সঙ্গে, আজও জানি না। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার চোখে ভেসে উঠল সেই বিবর্ণ, অসহায় অপমানিত মুখ। এবং তার চকিত পলায়ন। নিজের প্রতি ঘৃণায় আমি ছি-ছি করতে লাগলুম। ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে লোকটির কাছে ক্ষমা চাই। কিন্তু অনিমেষ ভট্টাচার্য তখন ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছেন। যে বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলার লোভে আমি লোকটিকে তাড়াতে চেয়েছিলুম, লোকটিকে তাড়িয়ে দেবার পর—সেই

বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলতেও আর আমার ভালো লাগল না।

অনিমেষ ভট্টাচার্যের কাছে আমার আর কোনোদিনই ক্ষমা চাওয়া হয়নি। কারণ, তাঁকে কোথায় খুঁজে পাব জানতুম না। কীরকমভাবে ক্ষমা চাইব, মনঃস্থির করতেও কয়েকদিন কেটে গিয়েছিল। তা ছাড়া, হঠাৎ পথের মধ্যে দেখে ওঁকে ডেকে যদি বলতুম, শুনুন, সেদিন আপনাকে যে আমি চিনতে পারি নি —সেটা আমার ভুল হয়েছিল—তা হলে রাস্তার লোকেরাও আমার কথা শুনে হতভম্ভ হয়ে যেত। তবু, আমি অনিমেষ ভট্টাচার্যকে খুঁজতে লাগলুম। যদি পথে আবার কখনো দেখা হয়, সেইমত পথের সমস্ত মানুষের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ ভাবে নজর রেখেছি। কিন্তু অনেকদিনের মধ্যেও তার সঙ্গে দেখা হলো না। ভদ্রলোকের ঠিকানাও আমি জানতুম না। সামান্য একটা ব্যাপার, তবু আমার মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে রইল।

তারপর আমার অপর এক বন্ধু কথায় কথায় একদিন বললন, তুই অনিমেষ ভট্টাচার্যকে চিনতিস? গালুডিতে যাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা ছিলাম সবাই? শুনলুম, গত সোমবার সেই ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেছেন।

আমার ইচ্ছে আছে, পর্বতশিখরে উঠে কিংবা গভীর সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে একদিন আমি অনিমেষ ভট্টাচার্যের কাছে ক্ষমা চাইব।

৫

প্যান্ট-সার্ট পরে সবে মাত্র জুতোয় ফিতে বেঁধেছি, এমন সময় হৈ-হৈ করে বৃষ্টি এল। অথচ বেরুতেই হবে আমায়। কয়েকদিন বুক-পোড়ানো গরমের পর বৃষ্টির জন্য আকাশের পায়ে ধরে সাদাসাধি করেছিলুম, কিন্তু এখন এমন জরুরি সময় বৃষ্টি আমার মোটেই পছন্দ হলো না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণুভাবে পা ঠুকতে লাগলুম।

মিনিট দশেক পরেই বৃষ্টি থামল যাহোক। গলির মোড়েই আর এক বিপত্তি। একটা বাস একটা গমবোঝাই লরিকে গোঁয়ারের মতন ধাক্কা মেরেছে। কেউ ভেঙে টুকরো হয়নি একটা মানুষও মরেনি, কিন্তু দু'জনেই এমন বেঁকে দাঁড়িয়েছে যে, পথ জোড়া, অর্থাৎ কিছুক্ষণ বাস চলবে না। এখান থেকে হেঁটে অন্য বাসের রাস্তায় যেতে হলে দশ মিনিট হাঁটতে হয়। হেঁটেই যেতুম, কিন্তু বৃষ্টিতে সামনে এক জায়গায় জল জমেছে, ওখানটা আমায় পেরুতে হলে জুতো প্যান্ট ভেজাতে হয়। একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি এখন যদি জুতোটা ভিজে পা স্যাঁতসেঁতে

হয়ে থাকে, তাহলে তো কোনো কথাই মুখ দিয়ে বেরুবে না। অথবা, সব কথাই বোকা বোকা শোনাবে।

আমাদের এখানে সাইকেল রিক্সা। দূরে একটি খালি রিক্সার টিনটিনি আওয়াজ শুনতে পেলুম। রিক্সাওয়ালা বলাই আমার চেনা, প্রায় ওর গাড়িতে বাজার থেকে আসি। হাত তুলে বললুম, বলাই দাঁড়াও।

বলাই আমার সঙ্গে চোখাচোখি না করে বলল, এখন আমি ভাড়া যাব না।

আমি একটু অনুনয়ের সুরে বললুম, ঐদিকেই তো যাচ্ছ, নিয়ে চলো না।

—যেতে পারি, এক টাকা ভাড়া লাগবে।

আমি শুনে অনড়। তিরিশ পয়সার রাস্তা, চল্লিশ কি পঞ্চাশ বলুক, তার বদলে সোজা এক টাকা! আমি কড়া গলায় বললুম, ব্যাপারটা কি? একটাকা চাইতে তোমার লজ্জা করে না। আট আনা দেব, চলো—

—বললুম তো, ভাড়া যাব না।

বলাইয়ের প্রত্যাখ্যান সপাং করে আমার মুখে লাগল। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ছোঁড়াটার দু'গালে দুই থাপ্পড় কশিয়ে দি। কিন্তু তার আর সময় পেলুম না। একজন সুসজ্জিত প্রৌঢ়, হাতে চামড়াব ব্যাগ, মেঘলা দিনেও চোখে কালো বোদ-চশমা, ভারী গলায় বললেন, চলো এক টাকাই দেব! এই বলে তিনি বলাইয়ের রিক্সায় উঠে বসলেন!

আমি অপমানে নীল-লাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। তাবপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, প্যাণ্টের পা দুটো ইয়াঙ্কি কায়দায় হাটু পর্যন্ত মুড়ে জুতো খুলে হাতে ঝুলিয়ে উদাসীন মুখে জলের মধ্যে সপ সপ করে হাঁটতে লাগলুম।

পরদিন সকালে মুদি দোকানে ব্লেড কিনতে গেছি। আমি একবেলা না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু দাড়ি কামাবার সময় পাতলা বিলিতি ব্লেড না হলে আমাব চলে না। ডিভ্যালুয়েশনের পর এসব ব্লেডের দাম বেড়ে গেছে। কিন্তু দোক্ষানের মালিক অধিকারীদা বললেন, আপনাব কাছ থেকে বেশি দাম নেব না, আমার পুরোনো কেনা ছিল, অন্যের কাছ থেকে বেশি নিচ্ছি, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাদা কথা। বসুন, বসুন, ঐ টুলটায় বসুন।

এই সামান্য কৃপার পরিচয় পেয়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। আমি তো বেশি দাম দেবার জন্য তৈরি হয়েই ছিলুম। অধিকারীদা মুদিব দোকানের মালিক হলেও অনেকটা বন্ধুর মতন। আমার সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করতে খুবই ভালোবাসেন। ওঁর এখনো দৃঢ় ধারণা হিন্দুস্থান-পাকিস্তান আবার এক হয়ে যাবে।

পাকিস্তান থেকে এসে ব্রজকিশোর অধিকারী এখানেরই একটা রিফিউজি কলোনিতে উঠেছিলেন, একটা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করতেন, উনি আই. এ.

পাশ এবং সংস্কৃতে বেশ ভালো জ্ঞান। প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টারও হয়েছিলেন, হঠাৎ মাস্টারিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। ইস্কুলের সেক্রেটারি অর্থাৎ আমাদের এলাকার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি হরিজীবন কুণ্ডুর সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি লাগত। হরিজীবনবাবু সেই ইস্কুলের আবহমানকাল ধরে সেক্রেটারি এবং ওখানে একটি অলিখিত আইন এই যে, সেক্রেটারির যে কন্যারত্নটি আবহমানকাল ধরে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, তাকে হেড মাস্টার বিনা পয়সায় পড়াবেন। এবং প্রত্যেক বছর পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার পর ছাত্রীর বদলে শিক্ষক মাথা পেতে গালাগালি খাবেন। এই সব ব্যাপারে চটাচটি করে অধিকারীদা মাস্টারি ছেড়ে মুদিখানা খুলেছেন। উনি এখন বলেন, দূর শালা! মাস্টারি করে পেটও ভরছিল না, মান-সম্মানও থাকছিল না। উঠতে বসতে ঐ শালা কুণ্ডুকে তোসামোদ করতে হতো। এখন মুদি হয়েছি, এতে সম্মান থাক না থাক, পেট তো ভরছে।

পেট যথেষ্টই ভরছে, অধিকারীদা এই দু'তিন বছরেই যথেষ্ট উন্নতি করেছেন, শুনেছি রিফিউজি কলোনীর মধ্যেই তিনি তিনতলা বাড়ির ভিত খুঁড়েছেন, সম্প্রতি। অধিকারীদা'র একমাত্র উচ্চাভিলাষ, একটি স্কুল খোলা—এবং তিনিই হবেন সেই স্কুলের সেক্রেটারি।

হরিজীবন কুণ্ডুকে আমি চিনি। ওর দশবারোখানা লরির ট্রান্সপোর্টের ব্যাবসা, আলু-পোঁয়াজের হোল-সেলার, পাচ-সাতখানি বাড়ির ভাড়া খাটানো ইত্যাদি নানান কাণ্ড। ওর ছেলে শম্ভু আমার সঙ্গে কলেজে এক সঙ্গে পড়ত, প্রায়ই ওদের বাড়ি যেতাম। শম্ভু বছর চারেক আগে মোটর-দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কিন্তু হরিজীবনবাবু এখনো আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, এমনকি ওঁর কন্যারত্নটিকে বিয়ে করে আমায় ধন্য হয়ে যাবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন এক সময়। আমি অবশ্য, ওকে দেখলেই সংসার ছেড়ে সাধু হয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করি।

যাই হোক, মুদির দোকানে বসে অধিকারীদা'র সঙ্গে ভিয়েৎনাম বিষয়ে তুমুল আলোচনা চালাচ্ছি, এমন সময় একটি খরিদ্দার এল। তাকিয়ে দেখি, কালকের সেই রিক্সাওলা বলাই, সর্ষের তেল কিনতে এসেছে। অধিকারীদা ওকে গ্রাহ্য না করেই বললেন, তেল নেই।

বলাই ক্ষুণ্ন হয়ে বলল, একটুও নেই? আমার যে একেবারে বাড়ন্ত!

—আছে, কিন্তু তোকে আমি বিক্রি করব না।

—কেন?

—ছ'টাকা কিলো দিতে পারবি?

—ছ'টাকা? গত হপ্তায় নিয়ে গেলুম চার টাকা চল্লিশ!

—আমার স্টকে দু'এক টিন আছে, তা তোকে দিতে যাব কেন তবে? আমার

বাঁধা বড়ো খদ্দেরদের ফিরিয়ে দেব? ছ'টাকা করে পারিস তো দে, নিয়ে যা। তোরা তাও পারিস, তোদেরই তো এখন রাজত্ব।

—চার টাকা থেকে ছ'টাকা! গরীবদের ওপর—

বলাই তেল না নিয়েই ফিরে গেল। অন্য কেউ হলে আমি ব্যাপারটায় বিরক্ত হয়ে অধিকারীদাকে দু'চার কথা বলতুম। কিন্তু বলাইয়ের ব্যাপারে আমার মনে হলো, বেশ হয়েছে। ওর কালকের ব্যবহারে এখনো আমার রাগ পড়েনি। অধিকারীদাকে কিন্তু আমি বলাই সম্পর্কে আগে কিছুই বলিনি। উনিই বরং বললেন, তুমি হয়তো ভাবছ, আমিও পাকা কালোবাজারী হয়েছি। কিন্তু ব্যাবসা করতে গেলে অনেক কিছু ঠেকে শিখতে হয়। কাল হরিজীবনের (এখন আর বাবু বলেন না) গোডাউন থেকে আলু-পেঁয়াজ আনতে গেলুম, আলুর দাম চাইলে আশী পয়সা কিলো। অথচ বাজারে তখনো সত্তর দাম যাচ্ছে। কী বললে জানো? আলুর স্টক কমে এসেছে, বড়ো বড়ো পাইকারদের না দিয়ে তোমাকে দিতে যাব কেন, যদি বেশি দাম না দাও! নিতে হয় নাও, নইলে পথ দেখো। কথাটা ঠিক, বড়ো খদ্দেররাই লক্ষ্মী, জিনিস শর্ট পড়লে তাদেরই আগে দিতে হয়। আমি আর কথা না বাড়িয়ে অধিকাবীদার দোকান থেকে উঠে পড়লুম।

পরদিন বিকেলবেলা আবার বৃষ্টি, আবার রাস্তায় জল। তবু ভাগ্যি এখনো বাস বন্ধ হয়নি। চলন্ত গাড়ি থেকে কাদা ছেটার ভয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময়ে বাসের বদলে একটা মোটরগাড়ি এসে থামল আমার সামনে। হরিজীবন কুণ্ডু মুখ বাড়িয়ে বললেন, কোথায় যাবে বাবাজী? উঠে পড়ো গাড়িতে।

উঠলুম। প্রশস্ত নতুন গাড়ি, ভাঙা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, তবু ঝাঁকুনি সামান্য। যাক, বসুদের আড্ডাখানা পর্যন্ত বিনা ভাড়ায় আরামে যাওয়া যাবে। হরিজীবনবাবু মোলায়েম গলায় বললেন, কোথায় থাকো বাবাজী, আজকাল আর দেখি না তোমাকে? আমি বললুম, এই আর কি। আজকাল আর কিছুই ভালো লাগে না।

—কোথায় চললে এখন?

আমি উদাস হয়ে গিয়ে উত্তর দিলাম, দেখি, কোনো ঠিক নেই। ভাবছি গোয়াবাগানের রামকৃষ্ণ মিশনে যাব একবার। ওখানে সন্ধেবেলা বেদপাঠ হয়, আমি শুনতে যাই মাঝে মাঝে।

—তা বেশ বেশ; হে-হে, এই বয়সে তোমার মতন এমন ধর্মে মতি আজকাল আর...বিয়ে-থা তো করলেই না...

—আপনি কোথায় চললেন?

—আর বলো কেন? আমরা সংসারের ঘানিতে বাঁধা। কর্তব্য করে যাচ্ছি। যাচ্ছি খুচরো পয়সা যোগাড় করতে।

—খুচরো পয়সা ?

—হ্যাঁ, খুচরো পয়সা। আজ আমার ছ'খানা লরি ছাড়বে, তার জন্য দেড়শো-দুশো টাকার খুচরো ভাঙানি দরকার। সিকি-আধুলি।

—লরির জন্য এত সিকি-আধুলি।

—তুমি ছেলেমানুষ, কিছুই জানো না দেখছি। অন্তত তিরিশ চল্লিশ টাকার খুচরো সঙ্গে না দিলে লরিওয়ালা গাড়ি ছাড়তেই চায় না। মাঝে মাঝে রাস্তার মোড়ে পুলিশকে পয়সা দিতে হবে না ?

—লরিওয়ালা পুলিশকে টাকাপয়সা ছুঁড়ে দেয় বটে দেখেছি, কিন্তু কেন দেয় বলুন তো ? বুঝতে পারি না!

—আগেকার দিনে বিধবাদের দেখেছ ? যখন গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন, রাস্তাব দু'পাশে ঠাকুর দেবতার মন্দিব দেখলেই একটা করে পয়সা ছুঁড়ে দিতেন। এখন আমাদের সেই অবস্থা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ দেখলেই পয়সা ছুঁড়ে দেয এবা।

—কেন ? শুধুই ভক্তির জন্য ?

—হে-হে। বলেছ ভালো। প্রত্যেক ট্রাকের পারমিট হচ্ছে ছ' টন মাল নেওয়া। আমাদের আট টন না নিলে গাড়ি ভর্তি হয় না, খবচ পোষায় না। ফলে সবাই আট টন করে নেয়। কিন্তু বেশি মাল নেবার জন্য কোনো ট্রাকের বিরুদ্ধে মামলার কথা কখনো শুনেছ ? শোনোনি তো! তার কারণ, বন্দোবস্ত আছে, ট্রাফিক কনস্টেবল দেখলে চার আনা, মোটরবাইকে চড়া সার্জন এসে ধরলে আট আনা, আব পুলিশের গাড়ি হলে পাঁচ টাকা। এই বাঁধা রেট। এখন এক-একটা গাড়ি যাবে কানপুব, আমেদাবাদ পর্যন্ত। কত পয়সা ফালতু যায় বলো তো ? মা ষষ্ঠীর কৃপায়, আমাদেব দেশেব আর যা কিছুরই অভাব থাক, পুলিশের তো অভাব নেই! হে-হে-হে--

মা ষষ্ঠীর কৃপা শুনে আমিও না হেসে পারলুম না। হরিজীবনবাবু রুমালে মুখ মুছে আবার বললেন, আট টন মাল নিলে ট্রাকের কোনোই ক্ষতি হবে না, এ জন্য কোনোদিনও অ্যাকসিডেণ্ট হয়নি, তবু এই ভ্যানতাড়া আইন করে রেখেছে। আরে বাপু, তোদের স্টেট বাসে যে ক্যাড়ো গাদা করে এত লোক তুলছিস, এত লোড তোলার কোনো নিয়ম আছে ? তার বেলা কিছু না। ট্রাফিক পুলিশের পাশ দিয়ে বাস ঠিক চলে গেল, কিন্তু লরি এলেই চার আনা। আর এই কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা আমার বাড়তি খরচা হচ্ছে, এবং আমি কোনো হিসাব দেখাতে পারব ? ইনকামট্যাক্সওলাদের আমি বোঝাতে পারব যে মশাই, ঘুষ দিতে আমার এত টাকা খরচ হয়েছে? তখন সেখানেও—

আমি, চেঁচিয়ে বললুম, থামান, থামান, আমি এসে গেছি। গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম, এত সব অকাট্য যুক্তি দেখে আমার মাথা ঘুরছিল।

মাঝে মাঝে পরপর কয়েকটা এমন ঘটনা আসে চোখের সামনে যে, মনে হয় তারা যুক্তি করে এসেছে, এসে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে নাচতে আরম্ভ করে। এর তিন-চারদিন পর, একদিন নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল! বড়ো রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি রাত বারোটা আন্দাজ। বিয়ের তারিখ, সুতরাং রিক্সা পাবার আশা খুব কম। চোখের সামনে ঝলমলে পোশাকপরা যাত্রী যাত্রিনীদের নিয়ে সটসট করে রিক্সা চলে যাচ্ছে। আরো দু'তিনজন লোক রিক্সার জন্য দাড়িয়ে। বহুদিন পর অনেক সুখাদ্য খেয়েছি—সুতরাং খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করাই স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গল—মনকে এই সব যুক্তি বোঝাচ্ছি, হঠাৎ আমার কাছেই এসে একটা রিক্সা খালি হলো। দেখি সেই বলাইয়ের রিক্সা। সেদিন ওর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, সুতরাং ওর রিক্সায় আমার উঠতে ইচ্ছে হলো না। তখন পাশ থেকে আর একজন লোক এসে বলল—চলো, ভাড়া যাবে?

বলাই গম্ভীর মুখে বলল, এক টাকা ভাড়া লাগবে!

—এক টাকা? তিরিশের জায়গায় ষাট নাও, তা বলে এক টাকা?

—ওর কম হবে না!

—চালাকি পেয়েছ?

—যেতে হয় চলুন, নইলে দূরে আমার অন্য সওয়ারি দাড়িয়ে আছে। তারা এক টাকা দেবে।

বলাই বেশ স্পর্ধার সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। যে ভদ্রলোক দর করছিলেন তাকে আমি চিনতে পারলুম। আমারই প্রতিবেশী, অত্যন্ত সজ্জন, পুলিশে চাকরি করেন। সম্প্রতি একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করে এ পাড়ায় এসেছেন। ভদ্রলোক এখন অবশ্য সাধারণ পোশাকপরা। লোকটি বেশ সাদালাপী ও ভদ্র। ওর অন্য নানাদিকে উৎসাহ আছে। পাড়ার ক্লাবের সাহিত্য বাসরেও উনি মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকেন শুনেছি। আমাকে বললেন, দাঁড়িয়ে থেকে আর কি হবে! চলুন, একসঙ্গে হেঁটেই যাওয়া যাক তা হলে। আমি বললুম, চলুন।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোকটি এক সময় বললেন, রিক্সাওলার কাণ্ডটা দেখলেন? তিরিশ নয়া'র জায়গায় একটাকা ভাড়া? এত রাত্রে রিক্সা বেশি নেই, আর অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে, সেই মওকা বুঝে যা-তা দাম হাঁকছে। একটু সুযোগ পেলেই সবাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। দেশের সব রকমের মানুষের মধ্যে যদি ও রকম নীতির অভাব দেখা যায় তাহলে দেশের উন্নতি হবে কি করে?

আমি বললুম, যা বলেছেন স্যার। দেশের উন্নতির কথা ভাবতে গেলে রাত্তিরে

আর ঘুমই আসে না। এই জন্য আজকাল ঘুমের বড়ি খাওয়া শুরু করেছি।

৬

ডাল্টনগঞ্জ থেকে মাইল পনেরো দূরে বেথলা, তারপর থেকে সংরক্ষিত বনভূমি। এখানে হরিণ আর বুনো মোষ চরে বেড়ায়, মাঝে মাঝে দু-একটা চিতার ডাক শোনা যায়, আর কখনো কখনো ছিটকে আসে হাতির পাল। মিশিরজি একটা আগুন জ্বালানো বাখারি তুলে বলল, ঐ দেখুন না হাতির পায়ের ছাপ, টাটকা, কাল রাত্তিরেই এসেছিল, ঐ দেখুন নাদি পড়ে আছে!

আমার সঙ্গে এক বন্ধু ও তার স্ত্রী ও চার বছরের কন্যা। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয় এবং গাড়ি খারাপ হয়। সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেমেছে ঝুপঝুপ করে অন্ধকার, সমস্ত অরণ্যদেশ রহস্যময় হয়ে এসেছে, দূরের যে-কোনো আওয়াজকেই আমরা বাঘের ডাক বলে মনে করছি।

গাড়িটা ঠেলে ঠেলে আমরা নিয়ে এলাম চেক পোস্ট পর্যন্ত, এখানকার চৌকিদার মিশিরজি, তার কাজ গাড়ি এবং ট্রাকগুলো পরীক্ষা করে দেখা—কেউ হরিণ মেরে নিয়ে যাচ্ছে কিনা অথবা চোরাই কাঠ। লণ্ঠন উঁচিয়ে মিশিরজি আমাদের দেখে বলল, ক্যা, পেট্রোল খতম? জেনানা আউর লেড়কি হায় সাথ মে—আপলোগকো তো বোহুৎ মুশকিল হো জায়গা! তারপব মিশিরজি গলায় উদাত্ত আশ্বাস এনে বলল যে, যাক ঠিক আছে—অন্য ট্রাক এলে সে আমাদের জন্যে পেট্রোল চেয়ে দেবে, সে গরমিন্টের পেয়ারের লোক, তার কথা অমান্য করবে —এমন ট্রাকওলা এ-তল্লাটে নেই।

আমরা জানালুম যে, আমাদের গাড়ির মেশিনে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, সারা সন্ধে আমবা দুজনে ঠোকাঠুকি করেও কিছুই করতে পারিনি। আজ রাতে আর এ-গাড়ি চালাবার উপায় নেই। পেট্রোল আমাদের গাড়ি ভর্তি গবগব করছে —ইচ্ছে করছে পেট্রোল ঢেলে গাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিই!

মিশিরজির ছোট্ট ঘরটার সামনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে একটা বিশাল গুড়িতে, কয়েকজন লোক সেই আগুন ঘিরে বসে হাত সেঁকছে। আশেপাশের গাও থেকে জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসেছিল ওরা। একটু শরীরটা গবম করে ফিরে যাবে, ছোট কলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেদম গাঁজা টেনে সবার চোখ লাল। তার দুদিন আগে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, অর্থাৎ প্রবল শীতের সময়।

আমরা রিজার্ভড ফরেস্টে পিকনিকে এসেছিলুম গাড়ি ভর্তি খাবার ও তেল

নিয়ে, সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই। আগুন ঘিরে বসে থাকা লোকগুলি যদি দুর্বৃত্ত প্রকৃতির হয়, রূপসী বন্ধুপত্নীর শরীর-ভরা গয়নার লোভে যদি এই নিঝুম রাত্রিতে আমাদের আক্রমণ করে, তবে আত্মরক্ষার জন্য মুখ ছাড়া আর তো কিছু সম্বল নেই। অন্ধকার নির্জনতায় আগুনের চারপাশে বসে-থাকা অপরিচিত লোক দেখলেই ডাকাত মনে হয়, সাধারণ মুখও মনে হয় ভয়ংকর। কিন্তু মিশিরজির গলার আওয়াজ শুনলে বোঝা যায়, লোকটা খাঁটি। জোয়ান শক্ত চেহারা, মাথায় ফেটি বাঁধা, গায় খাঁকি রঙের কোট, হাতে একটা মশালের মতো জ্বলন্ত কাঠ —অথচ লোকটার গলার আওয়াজ শিশুর মতো কচি, কিছুটা অহংকারী, কিন্তু শিশুর অহংকার। মিশিরজি হুংকার দিয়ে উঠল, এই ছেদিয়া, সাহেবলোগ আউর মাতাজিকে লিয়ে কুর্সি লাগাও।

একটা খাটিয়া আর দুখানা চেয়ার বেরুলো। বন্ধুটি ভালো হিন্দী জানেন, তিনি লোকগুলির সঙ্গে আমাদের সম্ভাব্য নিষ্ক্রমণের বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন, তাঁর গলা ঈষৎ দুমছমে। আমি লোকগুলির দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে সিগারেট ধরালুম। একমাত্র মেয়েরাই বিপদের একেবারে মুখোমুখি না-হওয়া পর্যন্ত অকুতোভয় থাকে। বন্ধুপত্নী অম্লানবদনে হুকুম করলেন, থোড়া পানি দিজিয়ে তো, পিনে কা পানি। আগুন-পোহানো একটা লোক ঘর থেকে শশব্যস্ত হয়ে জলের কুজোটা এনে দিতে যেতেই মিশিরজি হা-হা করে উঠল। তার হাত থেকে কুজো কেড়ে নিয়ে ধমকে ঠেঁট হিন্দীতে যা বলল, তার অর্থ এই যে সে একটা অচ্ছুৎ ভুঁইয়ার, সে জল ছুঁয়ে দিল কোন সাহসে ? তার হাতের ছোঁয়া জল কি এই ব্রাহ্মণরা খেতে পারে ? মিশিরজিও ব্রাহ্মণ—সেই শুধু বাবুদের জল দিতে পারে।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি জানলে কী করে যে আমরা ব্রাহ্মণ ?

কথা না বলে বড়ো বড়ো চোখ মেলে এমন স্তম্ভিতভাবে মিশিরজি দাঁড়িয়ে রইল যে, তার অর্থ আমার কী মাথা খারাপ ? এই রকম ভদ্দরলোকের মতো চেহারা, সাহেবি পোশাকপরা লোকরা কখনো ব্রাহ্মণ না হয়ে পারে ? এটুকু বোঝার বুদ্ধিও কি তার নেই ? তারপর কলসীর সবটা জল ফেলে দিয়ে আবার কুয়ো থেকে জল আনতে গেল সেই শীতের মধ্যে।

কাঠ-চেরার মতো একটা জোরালো আওয়াজে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বসতেই ওরা একজন হেসে বলল, উয়োতে ভৈঁইষছে, বাবু!—আমি অবশ্য বুনো মোষকেও খুব একটা বন্ধুস্থানীয় মনে করি না। তাছাড়া যে-হাতির পাল কাল এসেছিল, তারা আজও একবার বেড়াতে আসবে কিনা কে জানে! মনকে অবশ্য বোঝাচ্ছি যে আমাদের জন্য তো আর ভয় কিছু না, ভয় শুধু সঙ্গের মহিলা ও শিশুর জন্য।

আগুন-পোহানো লোকগুলির চোখে আমাদের ছোট্ট দলটি বেশ একটা কৌতূহলের সামগ্রী হয়েছে, ওরা বাড়ি যাবার জন্য উঠি-উঠি করেও যেতে পারছিল না। আমাদের কিছু-একটা ব্যবস্থা ওরা দেখে যেতে চায়। আমাদের অবশ্য কোনোই ব্যবস্থা হবার সম্ভাবনা নেই। সন্ধে পর্যন্ত এখান দিয়ে বাস যায়, শেষ বাসও চলে গেছে, কোনো ট্রাক থামিয়ে ওঠা যেতে পারে—কিন্তু মেয়েদের নিয়ে ট্রাকে ওঠা নিরাপদ নয়—ট্রাক-ড্রাইভারগুলো নাকি অধিকাংশই 'শ্বশুরাকা বেটা'। মিশিরজির ঘরে অবশ্য আমরা থেকে যেতে পারি— তাতে সে ধন্য হবে। কিন্তু আমরা ঠিক করলুম, সারারাত ঐ আগুনের পাশেই বসে জেগে কাটিয়ে দেব, সঙ্গে খাবার-দাবার তখনো আছে, এছাড়া শীত নিবারণের জন্য ব্র্যাণ্ডি।

মিশিরজিকে দেখলাম সবাই খুব খাতির করে। তার কারণ শুধু যে সে ব্রাহ্মণ তাই নয়, সে গভর্নমেণ্টের লোক। এ তল্লাটে বন-জঙ্গলের মধ্যে সেই একমাত্র গভর্নমেণ্টের লোক, সে রিপোর্ট করলে যে-কোনো লোককে পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে। এ কারণে মিশিরজিরও অহঙ্কারে যেন মাটিতে পা পড়ে না। মাঝে মাঝে চেক পোস্টের ওদিকে গাড়ি থেমে হর্ন দিচ্ছে, মিশিরজি চাবি দিয়ে গেট না খুলে দিলে যেতে পারবে না। হর্ন শুনে মিশিরজি মশালটা তুলে দেখে নিচ্ছে—ট্রাক না জিপ না মোটরগাড়ি। ট্রাক হলে তার আর নড়বার নামটি নেই। ওখানেই বসে থাকে। বন্ধ গেটের ওপাশে বারে বারে হর্ন দেয়। মিশির তবু চুপ করে বসে থেকে মিটিমিটি হাসে। আর বিড়বিড় করে—ইঃ! অত ফটফটিয়া কিসের? হতো গরমিণ্টের গাড়ি, ছুটে গিয়ে খুলে দিতুম। প্রাইভেট হয়েছিস, এখন ঠার যা। অগত্যা ট্রাকের ড্রাইভার নেমে গেট টপকে এদিকে আসে, মিশিরজির সামনে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে অনুনয় করে। সে তখন চাবির থোকা হাতে নিয়ে হেলতে দুলতে যায়। মশাল উঁচিয়ে সারা গাড়ি তন্ন তন্ন করে দেখে, মাডগার্ডে একটা চাঁটি লাগিয়ে বলে, যাও, পাস।

আমি মিশিরজিকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এই জঙ্গলে একা একা থাক, তোমার ভয় করে না? সে আত্মপ্রসাদের সুরে বলল, ডর লাগলে কি হবে, গরমিণ্টের কাজ, করতেই তো হবে। আগে যে লোকটা ছিল, একদিন রাত্রে হাতি এসে তার ঘরটা ভেঙে দিল, সে লোকটাও মরে গেল। সে লোকটা যে রাত্রে ঘুমোতো। মিশির কখনো রাত্রে ঘুমোয় না, আগুন জ্বেলে বসে থাকে।

আমি বললুম, মিশির, রাত্রে তোমার একা-একা ভয় লাগে না?

—তা তো লাগেই। এ শালা গাছপালা আর জন্তু জানবর, এ কি মানুষের বন্ধু হতে পারে? মানুষ মানুষকে চায়। কিন্তু কী করব, গরমিণ্ট যে তাকে এখানেই থাকতে বলেছে। সে গরমিণ্টের জন্য এত করে—অথচ গরমিণ্ট তার কথা মাঝে

মাঝে ভুলে যায়। এই দেখুন না, একটা টর্চ কবে থেকে স্যাংকসেন হয়ে গেছে, অথচ এখনো টর্চ এল না। লণ্ঠনের ক্রাচিন নেই আজ দু'হপ্তা, তবু গরমিণ্টের হোঁস নেই।—তারপর হেসে সোহাগের সুরে মিশির আবার বলল, আহা সে বেচারা গরমিণ্টই বা কি করবে। তাকে তো কত দেখতে হয়। আমার মতো চৌকিদার আরো কত আছে জেলা ভরে, পালামৌর জঙ্গল-ভরা চৌকিদার, সবার জন্যে ভাবতে ভাবতে গরমিণ্ট বেচারা থকে যায় মাঝে মাঝে।

বন্ধু বললেন, মিশিরজি তুমি বিয়ে করোনি কেন?

মিশির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এ জঙ্গলে কে থাকবে আমার কাছে? পাহাড়িয়া মুণ্ডা কিংবা ওরাওঁ—এ-সব ছোট জাতের মেয়েরা জঙ্গলে থাকতে পারে কিন্তু ব্রামভনের মেয়ে কী করে থাকবে? তারপর মিশির হা-হা করে হেসে উঠে বলল, একটা সাচবাত আপনাদের বলি, বাবু। গরমিণ্ট এমন অভিমানী, কিছুতে সতীন সহ্য করে না। একবার গরমিণ্টের কাছ থেকে ডেফো (ডি এফ ও) সাহেব এলেন আমি তাঁকে বললুম, হুজুর, আমার একটো বাত আছে। সাহেব বললেন, বল ঝটপট। আমি বললুম, হুজুর, সরম লাগছে। সাহেব বললেন, তবে বলতে হবে না। আমি তখন বললুম, হুজুর, আমি একটা সাদি করতে চাই। সাহেব বললেন, কর না। আমি বললুম, হুজুর আপনি ব্রামভন, আপনি তো জানেন, কোনো ব্রামভনের লেড়কি এখানে থাকতে চাইবে না। তা হলে আমি কি করে সাদি করব? সাহেব হাসতে হাসতে বলল কী জানেন, তবে হয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাদি কর, নয় সাদি করিস না। বুঝুন কী কথার কী উত্তর!

বন্ধুপত্নী এমন খিলখিল করে হেসে উঠলেন যে, বাচ্চার ঘুম ভেঙে যায় আর কি। আমরাও মুখ ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলুম। মিশিরজি আহত মুখে বলল, আসল ব্যাপারটা বুঝলেন তো? গরমিণ্ট ডেফোর কাছে আগেই বলে দিয়েছে, মিশিরের বিয়ে করা চলবে না। আমাকে এই আধিয়ার জঙ্গলে বাঘ আর হাথির মধ্যে রেখে গরমিণ্ট দূর থেকে মজা দেখছে। দেখুক! আমিও পিছ-পা নই। হুঁশিয়ার থেকে পাহারা দিচ্ছি, এক রাত্তিরও ঘুমোইনি। দেখি, আমার ওপর গরমিণ্টের মায়া হয় কিনা। হেঃ। আমিও ব্রামভন গরমিণ্টও ব্রামভন। কেউ কারুর থেকে কমতি নেই।

আমি বললুম, মিশির, গরমিণ্ট যে তোমাকে মাঝে মাঝে ভুলে যায়, তাতে তোমার রাগ হয় না?

মিশির একটা উদাসীন ভঙ্গি করে বলল, ভুলে তো যাবেই। আমার মতন শ-ও শ-ও হাজার হাজার চৌকিদার লিয়ে গরমিণ্টের কারবার। তবু দেখুন বাবু সাহেব, ভুলে ভি যাবে, লিকিন তাও এত হিংসুট কি আমায় সাদি কিছুতেই করতে

দেবে না। আমায় এখানে একা রাখবে।

কথা বলতে বলতে মিশির অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইল। ঈশ্বরেরই মতন গভর্নমেন্ট তার কাছে এক দুর্বোধ্য, জীবন্ত অস্তিত্ব। মিশিরের মুখ দেখলেই বোঝা যায়, সে একদিন না একদিন গভর্নমেন্টকে স্বচক্ষে দেখার প্রত্যাশায় আছে।

আমরা দুই বন্ধু পরস্পর ইংরেজিতে বললুম, মিশির হচ্ছে গভর্নমেন্টের প্রণয়ী। দয়িতাকে পাবার জন্য ভালোবাসার জোরে ও এই বিপদসঙ্কুল জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে। সামান্য কোনো নারীকে বিবাহ-বন্ধনে বাধার ওর আর দরকারটাই বা কি?

৭

বি এন জি এস কথাটা তো সবাই জানেন, অর্থাৎ বিলেত না গিয়ে সাহেব! আজকাল ঐ রকম বিলেত না-যাওয়া সাহেবদের উপদ্রব বড়ো বেড়েছে। মাঝে মাঝে তারা বড়োই বিরক্ত করে।

আমরা কখনো বিলেত-ফিলেত যাইনি এবং কস্মিনকালে যাবার আশাও নেই বলে, কোনো লোভও নেই। কোথাও ও প্রসঙ্গ উঠলে আমরা বলি, দূর দূর, আজকাল বিলেত-ফিলেত যাবার মধ্যে কোনো মজা নেই, যদি কোথাও কখনো যেতেই হয়, একেবারে চাঁদে বেড়িয়ে আসব।

কিন্তু আপাতত যখন চাঁদে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, এবং বিলেত যাবারও উপায় নেই, তখন মাঝে মাঝে শখ হয়, কোচবিহার কিংবা আলিপুরদুয়ার কিংবা পুরুলিয়া থেকে মাঝে মাঝে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? কাশী কিংবা কাশ্মীর, ঔরঙ্গবাদ কিংবা উটকামণ্ড যাবার সামর্থ্য আমার নেই। তাই কখনো কখনো ইচ্ছে হয়, পশ্চিমবঙ্গেই কোথাও বেড়িয়ে আসি। আমরা বাঙালিরা কজনই বা গোটা পশ্চিমবঙ্গ দেখেছি!

কুচবিহারের কথাই ধরা যাক, পশ্চিমবঙ্গেরই একটা শহর তো, কিন্তু কলকাতা শহরে খুব কম লোকই দেখি যারা কখনো কুচবিহারে গেছেন বা কুচবিহার সম্পর্কে কিছু জানেন। শোনা যায় শহরটা দেখতে সুন্দর, রাজার বাড়ি আছে, শুধু এইটুকুই ঐ শহর সম্পর্কে জ্ঞান, অথচ বাংলা দেশেরই শহর তো। এই মুহূর্তে কোনো বিখ্যাত বাংলা উপন্যাসের নাম মনে পড়ছে না, কুচবিহারের পরিবেশ নিয়ে লেখা। কোনো কারণ নেই, ক'দিন ধরে কুচবিহার নামটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল, এক-একবার শখ হতে লাগল, চট করে কুচবিহার ঘুরে আসি। পশ্চিমবঙ্গকে সম্পূর্ণ

জানবার একটা ছেলেমানুষী ইচ্ছে আমায় পেয়ে বসে।

হঠাৎ ট্রেনে চেপে বসলে কোনো অসুবিধে ছিল না। আমাদের ভ্রমণ তো এই রকম, হঠাৎ খেয়াল হলো, অবিলম্বে ট্রেনে চেপে বসা। পৌঁছে থাকা-খাওয়ার চিন্তা করতে হয় না, কিছু না হোক, হট্টমন্দির কিংবা রেলস্টেশনে তো শোবার জায়গা পাওয়া যাবেই, আর ভোজনং যত্রতত্র।

কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে একটু শৌখিনতা করতে ইচ্ছে হয়—ইচ্ছে হয়, বেড়াতে গিয়ে দাড়ি কামাবার জন্য গরম জল চাই, ঘরে বসেই চা খেতে চাই, রাত্রে ঘুমোবার আগে, ইলেকট্রিক আলোর সুযোগ চাই। সুতরাং ভাবলুম, এ বছরটা তো আন্তর্জাতিক পর্যটন বৎসর—সুতরাং কোনো একটি পর্যটন সংস্থায় গিয়ে কুচবিহার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া যাক।

গেলুম একটা পর্যটন সংস্থায়। উঃ, বি এন জি এস-দের কি দৌরাত্ম্য সেখানে! সুন্দর ফুটফুটে চেহারার ছেলেমেয়েরা সেখানে কাজ করে। চমৎকার সাজপোশাক, বসে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প-খুনসুটি করছে, কোনো সাহেব-মেম এলেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠছে তারা, সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠছে, ইংরেজির স্রোত বইয়ে দিয়ে সাহেব-মেমদেরও ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিচ্ছে। পাঁচ মিনিটে সব কিছু বুঝিয়ে ফেলছে।

আমি নেটিব তো, সেই জন্য আমাকে কারুর গ্রাহ্য নেই। মেয়েদের চোখে চোখ ফেললে চোখ সরিয়ে নিচ্ছে, ছেলেরা তো তাকাচ্ছেই না। সঙ্গে এক বন্ধু ছিল, সে বলল, চল ওরা পাত্তা দিচ্ছে না, সরে পড়ি। কিন্তু আমার সরে পড়ার ইচ্ছে নেই, কেননা, আমার ধারণা, পর্যটক যে শুধু সাহেবরাই তার কোনো মানে নেই। বাঙালিরাও ভ্রমণে বেরুতে পারে। অন্তত কুচবিহার যাবার কোনোই বাধা নেই। তাছাড়া, ওরা বোধহয় আশা করে, আমরাই আগে কথা বলব।

যাই হোক, একজন যুবককে পাকড়াও করে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ ফেলে বললুম, আমি একটু কুচবিহারে যাব, আপনারা যদি—।

যুবকটি মাঝপথেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কুচবিহার? ওখানে আমাদের কোনো টুরিস্ট লজ নেই!

—তা না থাক। তবু ওখানকার সম্পর্কে কিছুটা খোঁজখবর—

—হোয়াই পারটিকুলারলি কুচবিহার? কুচবিহার যাবেন কেন?

—এমনিই! কেন ওখানে যাবার কোনো নিষেধ আছে?

—না। তবে ওখানে যাওয়া খুব ডিফিকাল্ট। বেড়াতে যাবেন তো অন্য কোথাও যান না, শান্তিনিকেতন বা দীঘা—

—শান্তিনিকেতন বা দীঘায় গেলে শান্তিনিকেতন বা দীঘাতেই যাওয়া হবে,

কুচবিহার যাওয়া হবে না। কেউ যদি শখ করে কুচবিহারে যেতে চায়—

—তাহলে চলে যান—

—কি করে?

—প্লেনে চেপে, কিংবা ট্রেনে?

—না, মানে আমি জানতে চাইছিলুম?

—স্যরি, উই ক্যান্ট অফার য়ু মাচ হেলপ!

যুবকটি কাঁধ ঝাঁকালেন— শীতকালে হঠাৎ শরীরে জল পড়লে যেমন কেঁপে ওঠে লোক—কিন্তু যুবকটি নিশ্চয়ই ভাবলেন, ঐভাবে তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফরাসি কায়দায় শ্রাগ করেছেন। তা ভাবুন বা করুন, তাতে তো আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কুচবিহার শহরে কি ওঁর কোনো ঘোরতর শত্রু থাকে, যার জন্য উনি কুচবিহার সম্পর্কে অমন বীতরাগ? মনে হয়, কুচবিহারে কেউ যান, এটা ওর একেবারে মনঃপূত নয়। আমাকে প্রতিহত করে উনি তখন উদাসীন মুখে টাইয়ের গিঁট ঠিক করছেন।

আমি তবু বিনীতভাবে বললুম, দেখুন, আমার একটু কুচবিহারে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে ছিল। ওখানে হোটেল ফোটেল কিরকম আছে—সরকারের কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা সেই সব জানার জন্যই আপনাদের কাছে এসেছিলুম। আমি তো শুনেছি এইসব কথা জানাবার জন্যই আপনাদের অফিস খোলা হয়েছে।

যুবকটি পুনরায় রূঢ় ভাবে বললেন, বললুম তো, ও সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। গো টু দীঘা অর শান্টিনিকেটন।

এলাম আর একটি পর্যটন সংস্থায়। এবারে, একটি মহিলাকে গিয়ে বললাম, শুনুন, আমি একটু—

মহিলাটি হাতে পেন্সিল এবং পেন্সিলের মতন পাঁচটি আঙুল তুলে বললেন, গো টু দা জেন্টলম্যান ওভারদেয়ার প্লীজ।

মুখের বাক্যটি পুরো শেষ করতে না দিলে আমি ভয়ানক চটে যাই, তা ছাড়া, মহিলাটি যখন কাউন্টারেই দাঁড়িয়ে আছেন—তখন আমার সঙ্গে কথা বলবেন না কেন—তারও তো কোনো যুক্তি নেই। মেয়েরা শুধু মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবে, আর ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে—সরকারি অফিসে এরকম কোনো নিয়ম আছে নাকি? আমার বাংলা কথা শুনেও উনি কেন ইংরাজিতে কথা বলবেন?

কিন্তু মহিলাদের উপর চটে যাওয়া আমার ধাতে নেই বলে, মুখে তবু হাসি এঁকে রেখে কাউন্টারের অন্যধারের যুবকটির দিকে গেলুম।

এখানেও যথারীতি সুদর্শন যুবা, পরিপাটি চুল আঁচড়ানো, টাই-এ নিখুঁত গিঁট এবং ভাবলেশহীন মুখ। সিনেমার অভিনেতার মতন চোখ তুলে তিনি নিঃশব্দে

তাকিয়ে রইলেন। আমি আমার সম্পূর্ণ মনের ভাব তাঁর কাছে প্রকাশ করলুম। তিনি বললেন, খোচরাহার? ওয়ান মোমেন্ট। আমি দেখে দিচ্ছি—

আমি বিনীত ভাবে জানালুম, খোচরাহার নামে কোনো জায়গায় আমার যাবার ইচ্ছে নেই। আপাতত, আমি কুচবিহারে যেতে চাই।

—দ্যাটস রাইট, খোচরাহার, আমি দেখে বলে দিচ্ছি। তিনি কী একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। দেখা গেল, আমার কুচবিহার যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোনো উৎসাহ নেই তেমন, গেলেও হয় না গেলেও ক্ষতি নেই—এই রকম ভাব। বইটা খুলে তাঁর নিজস্ব ভাষায় আমাকে নানান তথ্য পরিবেশন করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তিনি টেলিফোন ধরছেন পল নিউম্যানের কায়দায়, কথা বলছেন পুলিশ কমিশনারের মতন।

ততক্ষণে কুচবিহারে যাবার ইচ্ছে আমার উপে গেছে, আমার মাথা ধরেছে, এবং কান কটকট করছে, চোখ জ্বালা করা শুরু হয়েছে। মনে মনে ঠিক করেই ফেলেছি, যদি কখনো কুচবিহার যাই তবে নিরুদ্দেশ যাত্রার ভঙ্গিতে বেরিয়ে পড়ব। কেননা, কারুর কথার মধ্যে ভাঙা ইংরেজি শুনলে আমার মাথা ধরে, ইয়ার্কি ছাড়া অন্যভাবে কেউ এক্সকিউজ মী বললে আমার কান চুলকায়। একবার ইচ্ছে হলো, আচমকা ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে দেখব, 'ষড়া অন্ধা' বেরিয়ে আসে কিনা।

তথ্য পরিবেশনে শেষ করে যুবকটি সেই নিস্পৃহ, ভাবলেশহীন কঠিন মুখে আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখ তুলে তাকালেন। হঠাৎ আমার মায়া হলো খুব। আহা, এত শখ এদের সাহেব সাজার, এই সব বি এন জি এস-দের [illegible] একবার অন্তত বিলেত ঘুরিয়ে আনাই উচিত। এখনই যা মুখ-চোখের চেহারা, বিলেত না গেলে তো মুখের চেহারা দিন দিন আরো আঁট হয়ে আসবে। তখন কি আর তাকানো যাবে মুখের দিকে। বরং সাহেবদের দেশ ঘুরে এলে যদি সাহেব হবার নেশা কাটে।

হঠাৎ একটু পরোপকার করার ইচ্ছে হয় আমার। আমি আচমকা জিভ বার করে একটা ভেংচি কাটলুম যুবকটির দিকে। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে সরে গিয়ে বললেন, ওকি। ওকি।

আমি আবার জিভ বার করে, চোখ উলটে, নাক বেঁকিয়ে আরেকখানা বিরাট

[redacted] হঠাৎ আপনার কি

আমি এখানে ডিগবাজি খাব?

হাসি পাবে?

—আমাকে হাসাবার জন্য আপনার ব্যস্ত হবার কারণ কি? হঠাৎ হাসতেই বা যাব কেন আমি?

—এমনিই। লোকের সঙ্গে কথা বলার সময়ে একটু হাসি মুখ করে রাখলে ক্ষতি কি?

—অকারণে বোকার মতন হাসবই বা কেন?

—বোকার মতন? না হাসলেই মানুষদের মুখ বোকার মতন দেখায়। কেন, সাহেবরা বুঝি হাসে না কখনো?

—শাট আপ! আজেবাজে কথা বলবেন না বলছি।

—ঠিক আছে তা হলে, হাসবেন না। আরো গম্ভীর হয়ে থাকুন। আমিই না হয় একটু হাসি। বেশ জোরে জোরে খানিকটা হাসি, কি বলুন?

৮

অনাদিবাবুকে দেখতুম, ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে বাগানে যেতেন। দেখতাম অথবা শুনতামও বলা যায়।

আমি তো জীবনে সূর্যোদয় দেখেছি কয়েকবার মাত্র। বস্তুত চড়া লাল রং আমার সহ্য হয় না বলেই ভোরের সূর্য আমি পছন্দ করি না। ঘুম ভেঙে চোখ খুলে তাকাই সেই তখন, যখন ভোরের লাল সূর্য বেশ হলদেটে হয়ে এসেছে। এবং শেষ বিকেলেও আমি সাধারণত অফিসে বা চায়ের দোকানে বন্দী থাকি বলে—গাঢ় সূর্যাস্তও আমার জীবনে খুব বেশি দেখা হয়ে ওঠেনি। আমার দিন কাটে ফ্যাকাসে—ঝাপসা রঙের মধ্যে। কিন্তু রিটায়ার্ড উকিল অনাদি সেনগুপ্ত গত পঞ্চাশ বছর ধরে নাকি ভোর সাড়ে চারটার সময় ঘুম ভেঙে বাইরে আসেন!

বছর দুয়েক আগে আমি কিছুদিন বর্ধমানে ছিলাম। আমাদের বাড়ির পাশেই অনাদিবাবুর বাড়ি, আমার শোবার ঘরের পিছনেই তাঁর বাগান। প্রত্যেক দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তের আগে বাগানে অনাদিবাবুর গান ও নাচে আমার ঘুম ভাঙে। অনাদিবাবু যখন বাগানে আসেন, তখন তাঁর হাতে জলের ঝারি ও খুরপি, পরনে হাফ-প্যান্ট ও পায়ে ঘুঙুর। গলায় রামপ্রসাদের গান। গানের সঙ্গে তাল ঠোকেন ঘুঙুর বাজিয়ে।

এক-একদিন ঘুম ভাঙে, তখন সূর্য ওঠেনি, শিয়রের জানলা দিয়ে আমি তাকিয়ে দেখছি, বাগানের প্রত্যেকটি গাছের পাশে ঘুরে ঘুরে অনাদিবাবু নেচে গান করছেন, আমায় দে মা পাগল করে, ব্রহ্মময়ী। তখন হয়তো কোনো স্বপ্ন

দেখতে দেখতে আমার ঘুম ভেঙেছে, সেই অপ্রাকৃত আলোয় অনাদিবাবুর অস্তিত্বও আমার কাছে অপ্রাকৃত মনে হয়। কিছুক্ষণ দুর্বোধ্যতায় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আবার আমি বিছানায় পাশ ফিরে ভাঙা ঘুম মেরামত করার চেষ্টা করেছি।

অনাদিবাবু কিন্তু পাগল বা বাতিকগ্রস্ত নন। গান বা নাচের সঙ্গে গাছপালার ফলন-বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক আছে—এরকম বিশ্বাসও তাঁর নেই। আসলে তাঁর খুব সাপের ভয়, বাগানে যদি সাপ থাকে এই আশঙ্কায় তাঁর গান ও নাচ—শব্দ পেলেই নাকি সাপ দূরে চলে যায়। এবং ওঁর ঘুঙুর পরার খবর ওর বাড়ির বাইরে আমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না।

বাগানের সম্পূর্ণ পরিচর্যা সেরে সাতটা আন্দাজ তিনি আমার জানলার পাশে এসে গলা খাকারি দিয়ে ডাকতেন, কী, ঘুম ভাঙল? ইয়ং ম্যানের পক্ষে এত ঘুম—আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ—এই হচ্ছে গিয়ে... তখন আমি গভীর ঘুমে মগ্ন এবং সকালের ঘুম এক ডাকে ভাঙে না।

অনাদিবাবুকে আমার গোড়ার দিকে বেশ ভালোই লাগত। রিটায়ার্ড লোকেরা সাধারণত একটু বেশি কথা বলেন এবং উনিও সুযোগ পেলেই আমাকে ধবে রাজ্যের কথা শোনাতেন কিন্তু ওঁর কথা শুনতে প্রথম প্রথম খারাপ লাগত না। লোকটির পুষ্পপ্রীতি ছিল অসাধারণ। স্বাস্থ্যবাতিক কিংবা অন্য কিছুর জন্যই ভোবে ওঠা নয়, শুধুই বাগানের জন্য। সকাল নয়, সারাদিনই প্রায় বাগানে কাটে তাঁর। এবং রিটায়ার করার বহু আগে থেকেই এই শখ।

বেশ বড়ো বাগান, অনেক ফুল ফোটে—যদিও অনাদিবাবু ফুল বিক্রি-টিক্রি করার কথা ভাবেন না, ফুলের আর কোনোই প্রয়োজন নেই। তিনি ফুলগুলোকে নিষ্কামভাবে ভালোবাসেন। নতুন গোলাপের চারা লাগাবার পর ওঁর ধৈর্য ডারুইনকে হার মানায়। যতক্ষণ না সেই গাছে ফুল ফুটছে—তিনি একাগ্রভাবে সেদিকে চেয়ে থাকেন।

সকালবেলা সেদিন এসে বলেন, জানেন এত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলুম না—তখন ওঁর দীর্ঘশ্বাস ও করুণ মুখচোখে ফুটে ওঠে পুত্রশোক, কিন্তু আসলে মারা গেছে একটা চন্দ্রমল্লিকার চারা। মফঃস্বল আদালতের উকিল ছিলেন, জীবন কেটেছে নোংরা আদালত ঘরে চোর-জোচ্চোর আর বদমাসের সঙ্গে, তবু কি করে ওঁর এমন সৌন্দর্যবোধ রয়ে গেছে ভেবে আমি আশ্চর্য হতুম। উনি আমাকে বিভোর হয়ে বলতেন, ক্যালিফোর্নিয়া পপি যখন প্রথম ফোটে—ফুলের ভেতরটা তাকিয়ে দেখবেন, কী নরম রঙ, ওরকম রং আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেখবেন না!...ওটা কি ফুল বলুন তো? চিনতে পারলেন না? কাঞ্চন!...ওকি আপনি অতসীও চেনেন না। অবশ্য এরকম ডবল-অতসী আমিও আগে দেখিনি! ওটা? ওটা বিদেশী ফুল

—ওর নাম নাসটেসীয়ান। আহা, ওই বেলফুলগুলো দেখুন, বড়ো অভিমানী ওরা, একটু যত্নের ত্রুটি হলেই কী রূপ, আহা চক্ষু সার্থক!

ফুল সম্পর্কে আমার অবশ্য তেমন কোনো ঔৎসুক্য নেই! কিন্তু ফুল সম্পর্কে অনাদিবাবুর ওরকম আন্তরিক ভালোবাসা দেখতে আমার ভালোই লাগত। তা ছাড়া, আমার শিয়রের জানলা দিয়ে যখন তাঁর বাগানের নানা ফুলের সম্মিলিত সুগন্ধ ভেসে আসত—তখন আমি বিনা পয়সার আনন্দ উপভোগের স্বাদ পেতুম!

অনাদিবাবুর তেমন কিছু শিক্ষাদীক্ষা ছিল না, কথা বলে দেখেছি, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে ওঁর কোনো জ্ঞানই নেই। বেশির ভাগ লোকই যে-রকম হয়, ইস্কুল-কলেজে পড়েছেন ডিগ্রি নেবার জন্য, বাকি জীবনটা খরচ করেছেন জীবিকার জন্য, এর বাইরে আর কিছু নেই। তবু এই অপ্রয়োজনীয় পুষ্পপ্রীতি ওঁর মধ্যে এল কি করে? তবে কি ওঁর ভিতরে কোনো আলাদা সৌন্দর্যবোধ আছে—যা শিক্ষা কিংবা প্রেরণার অপেক্ষা রাখে না? কিন্তু এই সৌন্দর্যবোধটাই বা কি করে একতরফা হয়? অনাদিবাবুর বাড়িতে গিয়ে কিন্তু আমি খুবই দমে গেছি।

অনাদিবাবুর বাগান ঝকঝকে তকতকে সাজানো, কোথাও একটু অনাবশ্যক বা ময়লা নেই, ছবির মতন। কিন্তু ওর বাড়িটা যাচ্ছেতাই। অনাদিবাবুর তিন ছেলে—দুই মেয়ে। বড়ো ছেলে অসবর্ণ বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। খুব অভাবের সংসার নয়, কিন্তু বাকি ছেলেমেয়েগুলোর বিশ্রী জামাকাপড়, সারা বাড়িটা অগোছালো ছন্নছাড়া। বারান্দায় বসার জায়গায় কয়েকখানা বাজে ক্যালেণ্ডার ঝুলছে, কাপড়ের ওপর সূচের সেলাই-করা পুকুর পাড়ে তালগাছের একটা বিকট ছবি বাধানো। অনাদিবাবু স্ত্রীকে ডাকলেন গোবিন্দর মা বলে—বললেন, আমাদের ইয়েকে চা দাও এক কাপ—আবার চোদ্দ ঘণ্টা লাগিও না যেন!

চা নিয়ে এল একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে, যথারীতি কাপের কানাগুলো ভাঙা। মেয়েটি বলল, বাবা, তোমাকেও চা দেব? অনাদিবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, দিবি না তো কি? আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে! মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, অনাদিবাবু আবার ডেকে বললেন, এই ভুন্টি (বেশ দেখতে মেয়েটিকে, কিন্তু তার নাম ভুন্টি) তুই আবার বাঁকা সিঁথি কেটেছিস? ইস্কুলে গিয়ে এইসব বিবিয়ানা শিখেছিস—ছাড়িয়ে দেব।

মেয়েটি খতমত খেয়ে বললে, কই না তো! দিদি তো চুল বেঁধে দিয়েছে!

আমি তাকিয়ে মেয়েটির চেহারায় কোনো বিবিয়ানার চিহ্ন দেখতে পেলুম না। ঐটুক মেয়ের রঙীন ফ্রক পরাই উচিত ছিল, বেণী দুলিয়ে ছোটাছুটি করলেই ওকে মানাতো বেশি, কিন্তু সে-সব বোধহয় ওর বাবার পছন্দ নয়, মেয়েটি একটা

সাদা রঙের (সুতরাং আধময়লা) শাড়ি, পরা, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো, আজকালকার মেয়েদের ধরনে সিঁথিটা বুঝি একটু বাঁ পাশে। বাবার সামনে ভয়ে মেয়েটির মুখ আড়ষ্ট।

অনাদিবাবু ফের বললেন, দিদি? দিদি তো সিনেমা দেখে ওসব শিখছে! দাঁড়া, আজ আসুক হারামজাদী! বলেই অনাদিবাবু ফড়াৎ করে সিকনি ঝেড়ে চেয়ারের গায়েই হাত মুছলেন। ঘেন্নায় আমার গা বমি-বমি করছিল, কোনোক্রমে বিদায় নিয়ে ওঁর ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে আমি ফিরে এলাম।

এ কী ধরনের সৌন্দর্যবোধ? ভাষায় রুচিজ্ঞান নেই, আচার-ব্যবহার অসুন্দর অথচ ফুলের সৌন্দর্যকে ভালোবাসার কি যুক্তি? এখনো কানে ভাসে অনাদিবাবুর কথা, সব সাদা ফুলই কিন্তু একরকম সাদা নয়, বুঝলেন? রজনীগন্ধা আর গন্ধরাজ —এ দুটো হাতে নিয়ে দেখুন, দুটো দু'রকম সাদা। পপি ফুলের ভেতরে তাকিয়ে দেখবেন, আহা, কি নরম রং!—এই অনাদিবাবুকেই দূর থেকে চিৎকার করতে শুনেছি, এই লেটো (ছেলের নাম) আবার বেডিও খুলেছিস? দিনরাত খালি গান-বাজনা—হারামজাদা ছেলে জুতিয়ে তোমার—। দুর্বোধ্য মানুষ!

এরকম মানুষ আমি আরো অনেক দেখেছি। সেজ মাসিমাকে দেখেছি, গল্প-উপন্যাস পড়ার দারুণ নেশা। রোজ লাইব্রেরি থেকে বই আনা চাই-ই। শিকার কি অ্যাডভেঞ্চার তাঁর ভালো লাগে না, তার চাই শুধু প্রেমের কাহিনী। এবং সে প্রেমও ব্যর্থ হলে চলবে না। প্রায়ই আমাকে বলতেন, দূর, দূর, এ কি বই এনেছিস? এ যে একেবারে বাজে বই। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা-মেয়েটায় ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল! সেই সেজ মাসিমাকেই দেখেছি কোথাও চেনাশুনো কেউ প্রেম করে বিয়ে করলেই তিনি রেগে আগুন হয়ে যেতেন। বলতেন ছি ছি, বাবা-মার কথা একবার ভাবল না, ছি ছি—। আমার মামাতো ভাই এম. এ. পড়ার সময় ক্লাসের একটি মেয়েকে বিয়ে করল বলে—মাসিমা সে বিয়েতে নেমন্তন্নই খেতে গেলেন না!

এরও না হয় মানে বুঝি, কিন্তু শশাঙ্কবাবুর চরিত্রের কি মানে?

শশাঙ্কবাবু একজন প্রৌঢ় শিক্ষক, আমাদের প্রতিবেশী। জোয়ান দশাসই চেহারা, শিক্ষক হবার বদলে মিলিটারি অফিসার হলেই তাঁকে মানাতো। সকাল-দুপুরে মাস্টারি, তারপরও টিউশানি—দিনরাত অর্থোপার্জনের নেশায় কাটছে। কিন্তু ওঁরও আর একটা অদ্ভুত নেশা আছে।

বাড়ি ফেরার পথে তিনি প্রায়ই একটা কুকুরছানা কিংবা বেড়ালছানা নিয়ে আসেন। রাস্তার পাশে যদি দেখেন কোনো অসহায় বেড়ালছানা কিংবা কুকুরছানা মিউ মিউ বা কেঁউ কেঁউ করছে, তিনি জলকাদা-মাখা অবস্থাতেও তাকে বুকে

তুলে আনবেন। এই দুর্মূল্যের দিনেও খেয়ে ওঠার পর তিনি আট-দশটা কুকুরকে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ান।

অনেক বাড়ির বেড়াল পার করার জন্য শশাঙ্কবাবুর বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে আসে। শশাঙ্কবাবু দেখতে পেলেই সে বেড়ালছানাকে বাড়িতে ডেকে নেবেন।

ওঁর পাশের বাড়ির ভদ্রলোক সস্তায় পেয়ে চারটি মুরগি কিনেছিলেন একবার, প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে খাবেন—এই মতলবে। তার মধ্যে দুটো মুরগি সকালবেলা শশাঙ্কবাবুর পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তিনি তখন মুড়ি খাচ্ছিলেন, দুটো মুড়ি ছড়িয়ে দিলেন ওদের জন্য। সেগুলো মুহূর্তে শেষ করে মুরগি দুটো আবার মুখ তুলে চাইল। শশাঙ্কবাবু হাসতে হাসতে ছেলেমেয়েদের ডেকে বললেন, দ্যাখ, দ্যাখ, মুরগি দুটো আমার কি রকম পোষা হয়ে গেল, হাত থেকে মুড়ি খাচ্ছে!

তারপরই শশাঙ্কবাবু চলে গেলেন তাঁর প্রতিবেশীর কাছে। ও মুরগিদুটো মারা চলবে না। অনেক ঝুলোঝুলি করে তিনি সে দুটোকে কিনে নিলেন, সে দুটো তাঁর বাড়িতেই থেকে গেল। ছাগলের বাচ্চা কোলে নিয়ে শশাঙ্কবাবুকে ছুটির দিন মর্নিং ওয়াক করতেও আমি দেখেছি। পিছনে চলেছে কুকুরের পাল।

শশাঙ্কবাবুকে কি দয়ালু লোক বলব? ইস্কুলে ছাত্ররা ওঁর নাম দিয়েছে যমরাজ। ছেলেরা ওঁকে যমের মতোই ভয় করে এবং ওঁর হাতের থাপ্পড় খায়নি—এরকম ছেলে একটিও নেই। ঐ বিশাল পুরুষের হাতের থাপ্পড় যে কি ভয়াবহ, তাও অনুমান করা যায়। শুনেছি, ঐ ইস্কুলের ভোজপুরী দারোয়ানকে কি যেন কারণে তিনি একবার চড় কষিয়েছিলেন, সে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং পরে চাকরি ছেড়ে দেয়।

আমি শশাঙ্কবাবুর ছাত্র ছিলাম না, ওঁর নিষ্ঠুরতার কিছু-কিছু কথা জানি। এক রবিবার সকালে আমি কোনো কারণে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। কথাবার্তা বলছি, এমন সময়ে একটা বাচ্চা ভিখারি মেয়ে ভিক্ষে চাইতে ওঁর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কথা থামিয়ে শশাঙ্কবাবু ক্রুদ্ধ চোখে মেয়েটার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, একেবারে বারান্দার ওপর উঠে এসেছে—অ্যাঁ? যত রাজ্যের অজাত কুজাত ছোটলোক—একেবারে ঘরের মধ্যে, সাহস বেড়ে গেছে, না?

বলতে বলতেই উঠে গিয়ে শশাঙ্কবাবু সেই ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া মেয়েটির কান ধরে মুচড়ে দিলেন। ঐ বিশাল পুরুষের হাত এবং রোগা-পাতলা মেয়েটির কান—মেয়েটা তীব্রভাবে কেঁদে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কানের গোড়া থেকে রক্ত পড়তে লাগল। শশাঙ্কবাবু বললেন, দূর হ! শশাঙ্কবাবুর ঘরে বারান্দায় কুকুর-বেড়াল-ছাগল-মুরগি যথেষ্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পাশেই পড়ল মেয়েটির কয়েক

ফোঁটা রক্ত। আমি আবার গাঢ় লাল রং দেখতে পারি না—তাড়াতাড়ি চলে এলাম সেখান থেকে।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে শুনলাম, শশাঙ্কবাবুর ছোট ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছেলেটা যখন খেতে বসেছিল, একটা কুকুরবাচ্চা এসে একেবারে ওর ভাতের থালায় মুখ দেয়। রাগের চোটে ছেলেটা, মোটে এগারো বছর বয়েস, গেলাস ছুঁড়ে মারে কুকুরটার দিকে। কুকুরটার ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে গেছে!

বাড়ি ফিরে সমস্ত পোষা জন্তু-জানোয়ারের একবার খবর নেওয়া শশাঙ্কবাবুর অভ্যেস। সেদিন ফিরে ঐ ব্যাপার দেখে তিনি ছেলেকে তুলে প্রবল আছাড় দিয়েছেন। ছেলেটা সেই থেকে রক্তবমি করছে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ। কী বলব একে? দয়া?

৯

মেয়েটি বলল, দেখি, আপনার হাত দেখি। হাত দেখে আমি বলে দিচ্ছি আপনি কতদিন বাঁচবেন।

আমি সকৌতুকে বললুম, তুমি হাত দেখতে জানো নাকি!

—হুঁ। খুব ভালো জানি! দেখি, হাতটা দিন, বাঁ হাত।

—কিন্তু এরকম তো কথা নয়। এটা স্বাভাবিক হচ্ছে না।

—কি স্বাভাবিক নয়?

—মেয়েরা কখনো ছেলেদের হাত দেখতে চায় নাকি? ছেলেরাই তো প্রথম আলাপের কয়েক দিন পর মেয়েটির হাত দেখতে চাইবে। ডান হাতখানা টেনে নিয়ে, বেশ জোরে চেপে ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকবে। কিছু বলবে না। তারপর মেয়েটি বলবে, কই কিছু বলছেন না যে! বলুন!—তখন ছেলেটি সোজা মুখ তুলে একদৃষ্টে মেয়েটির চোখের দিকে তাকাবে এবং আস্তে আস্তে বলবে, আমি হাত দেখে কিছু বলতে জানি না, চোখ দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারি—এই রকম ভাবেই তো প্রেমের সংলাপ শুরু হয়।

মেয়েটি হাসতে হাসতে বললে, বাঃ! ছেলেদের এসব গোপন পদ্ধতি আপনি আগে থেকেই আমাকে বলে দিচ্ছেন কেন?

আমিও হাসতে হাসতে বললুম, আমি কি তোমার প্রেমে পড়তে যাচ্ছি নাকি? প্রেমে পতনের পরই মূর্ছা। আমি শুধু তোমাকে সাবধান করে দিলুম, কোনো

ছেলের মুখে এসব কথা শুনেই মূর্ছা যেও না। এটা হচ্ছে ছেলেদের একটা মুখস্থ-করা টেকনিক। এখন তুমি যদি কোনো ছেলের হাত দেখতে চাও, তা হলে হয়তো সে ভাবতে পারে যে, তুমিই তার প্রেমে পড়তে চাইছ।

—আপনার নিশ্চয়ই সে ভয় নেই?

—ভয় কি বলছ, এরকম দুরাশাও নেই একটুও।

কফির কাপে চুমক দিতে দিতে মেয়েটি বলল, প্রেমে পড়ার জন্য ছেলেদের আর কি কি মুখস্থ-করা টেকনিক আছে বলে দিন তো। আগে থেকে সাবধান হয়ে যাব!

—কেন, এত সাবধান হবার ইচ্ছে কেন? আঘাত পেয়েছ বুঝি?

কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল, সে কথা আর আপনাকে বলে লাভ কি? আপনার কাছে তো আর সাবধান হবার দরকার নেই! সত্যি বলুন না, আপনি হাত দেখতে জানেন!

—না। তুমিই বরং আমার হাতটা দেখে দাও তা হলে!

—আপনি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন?

—না!

—কেন?

—বড্ড মিলে যায় যে। ঐজন্য বিশ্বাস হয় না। এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিল, আমার কিছু লেখাপড়া হবে না। সত্যিই হয়নি। একজন বলেছিল ১৪ বছর বয়সে আমি হারিয়ে যাব, সত্যিই ১৪ বছর বয়সের পর থেকে এ পর্যন্ত আমি হারিয়ে রয়েছি। বলেছিল, বিদেশে ভ্রমণের রেখা আছে—আমি যেখানে জন্মেছিলুম সে জায়গাটা এখন পাকিস্তানে—সুতরাং বিদেশে ভ্রমণ তো হয়েই গেছে। বলেছিল, হাতে একেবারে টাকাপয়সা জমবে না। টাকাপয়সা হাতে আসেই না, সুতরাং জমার কথাও ওঠে না। এতগুলো সব মিলে গেলে ভাল্লাগে না! তাই মনে হয়, হাত দেখা না মাথা আর মুণ্ড।

—আমার কিন্তু একটাও মেলেনি জানেন! আমার কুষ্ঠিতে আছে আমি ২২ বছর বয়সে বিধবা হবো। তিনজন বাঘা-বাঘা জ্যোতিষীও আমার হাত দেখে সেই একই কথা বলেছেন, একেবারে স্পষ্ট নাকি লেখা আছে। ঐজন্য আমি রমেনকে বিয়ে করিনি। আর কাউকে করবও না। আমার এখন ২৭ বছর বয়েস, তা হলে বলুন, আমার হাতের রেখা কি মিলল? কুমারী আর বিধবা কি এক?

আমি বললুম, এই স্নিগ্ধা, তুমি যে দেখছি হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ। এতক্ষণ হাসি-ঠাট্টা হচ্ছিল বেশ। কী ব্যাপার? রমেন, কোন রমেন?

—ইকনমিকসে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছিল রমেন সান্যাল, আপনার বোনের

সঙ্গে এক ইয়ারেই তো পরীক্ষা দিয়েছিল।

—সে ছেলেটা এত বোকা যে এই কথা বিশ্বাস করে বিয়ে করল না? তোমার মতন এমন একটা চমৎকার মেয়েকে—

—রমেন রাজি ছিল। রমেনের বাড়ির লোক রাজি হয়নি কিছুতেই—আমার মতন রাক্ষসগণ মেয়েকে কিছুতেই ঘরে নিত না। তা ছাড়া, আমিও রমেনকে বিয়ে করতে রাজি হইনি।

—কেন? তুমি এসব সিলি জিনিসে বিশ্বাস করো—

—দেখুন, রমেন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু ও এ-ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেনি, খানিকটা শিভালরি দেখিয়েই রাজি হয়েছিল। তাতে আমি রাজি হই কি করে? যদি আমি সরে যেতুম, তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আমার বিধবা হওয়া মানে তো রমেনের মরে যাওয়া, তাতে আমি কখনো রাজি হতে পারি?

—রমেন এখন কোথায়? বাইশ বছর পেরিয়ে গেছে, তার মানে তো ফাড়া কেটে গেছে।

—রমেন দিল্লিতে চাকরি পাবার পর ওখানে বিয়ে করেছে। ভালোই করেছে। বছরের হিসেব ভুল হতে পারে। বাইশ বছরে না হয়ে আমার বত্রিশ বছরেও ফলে যেতে পারত। আমি সে চান্স নিইনি। কিন্তু, এখন জ্যোতিষীদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, বিধবা আর কুমারী কি এক? আমার হস্তরেখায় বিধবা হবার কথাই আছে, কুমারী থাকার কথা তো নেই?

—তুমি এরকম একটি বোকা মেয়ে তা তো জানতুম না। এতদিন তো বেশ চালাক চতুর হাসিখুসি মেয়ে বলেই জানতুম। এরকম ভুতুড়ে বিশ্বাস নিয়ে জীবনটা নষ্ট করার কোনো মানে হয়?

—আমি যে অন্য সবার মিলে যেতে দেখেছি। রমেনের হাতে ছিল, ওর স্বাস্থ্যবতী, ভাগ্যবতী, লক্ষ্মীশ্রীময়ী বউ হবে। ও বলত, আমিই নাকি সেই মেয়ে। কিন্তু আমি নই, রমেন অবিকল ঐ রকমই একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখে আছে। আমার দাদার হাত দেখে বলছিল, বউয়ের ভাগ্যে অনেক টাকাপয়সা হবে। দাদা টি মার্চেন্ট বি চক্রবর্তী অ্যান্ড কোম্পানির এক পার্টনারের একমাত্র মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করে প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছে। আমাদের বাড়ির চাকরটার হাতে ছিল, ওর এক ছেলে সর্পাঘাতে মারা যাবে। সত্যি সত্যি দেশ থেকে সেই রকম চিঠি এল।

—আরো কত লোকের মেলেনি, শুনবে? আমার কাকিমার হাতে ছিল—ওর তিনটি ছেলেমেয়ে হবে, তার মধ্যে বড়ো ছেলেটি কুলাঙ্গার হয়ে মাকে খুব কষ্ট

দেবে। কাকিমার একটিও সন্তান হয়নি। আর ঐসব ব্যাপারেই হাসপাতালে অপারেশন করাতে গিয়ে তিনি মারা গেছেন। আমাদের অধ্যাপক দীনেশবাবুর হাতে ছিল, উনি ১৪ বছর রাজবন্দী থাকবেন। অথচ পুলিশ ওঁর দিকে একবারও কৃপাদৃষ্টি দিল না। একবার শিক্ষক আন্দোলনে সত্যাগ্রহ করেছিলেন, সেবার দেড়শো শিক্ষক গ্রেপ্তার হলো, তবু পুলিশ বেছে বেছেই যেন ওঁকেই বাদ দিয়ে গেল। পুণ্যবান দীনেশবাবু গত বছর গঙ্গালাভ করেছেন পুলিশকে সম্পূর্ণ কলা দেখিয়ে। এর উল্টোও আছে, আমার পিসতুতো বোন মমতার সঙ্গে অসীমের বিয়ে হলো কতরকম কুষ্ঠী মিলিয়ে, সব পণ্ডিতেরা বললেন একেবারে রাজযোটক! আশি বছরের টানা দাম্পত্যজীবন বাঁধা। দেড় বছরের মধ্যে আকসিডেন্টে মারা গেল অসীম। আরো শুনবে?

স্নিগ্ধা ম্লানভাবে হেসে বলল, না। কিন্তু আমার মধ্যে যে বদ্ধমূল ভয় ঢুকে গেছে। আমি আর কোনো ছেলের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারি না। কেউ যদি খানিকটা অ্যাডভান্স করে, আমি নিজেকে গুটিয়ে নিই। আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি কি জানেন, আমি সাদা থান পরে কাশীর গঙ্গায় স্নান করছি।

আমি ওর পিঠে একটা কিল মেরে বললুম, দূর ছাই। রমেন গেছে, এবার হেমেনকে ডাকো।

—কে হেমেন?

—হেমেন না হয় বরুণ না হয় শ্যামল, না হয় বিমল। ওদের মধ্যে কেউ যদি তোমার হাত দেখতে চায়, তুমি আগে কিছু বলবে না। সে যদি অনেকক্ষণ তোমার হাত ধরে বসে থাকে এবং কিছু কথা না বলে, এবং খানিকটা বাদে তোমার প্রশ্নের উত্তরে সে যদি বলে, সে হাত দেখতে জানে না, সে চোখ দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারে, তবে তাকে বলো, ভবিষ্যৎ বলতে হবে না। আমার শুকনো চোখের মধ্যে চোখের জল দেখতে পাচ্ছেন?

—যদি দেখতে পায়, তবে কি হবে!

—চোখে চোখে তাকিয়েই সত্যি ভবিষ্যৎ দেখা যায়। যে তোমার চোখের জল দেখতে পাবে, সে তোমার জন্য মরতেও রাজি হবে। প্রেমিকার জন্য প্রাণ দেবার ইচ্ছে না হলে সত্যিকারের ভালোবাসা কখনো জাগে না।

স্নিগ্ধা এতক্ষণ পরে আবার হেসে উঠে বলল, ইস, আপনি এমন ভাবে বলছেন, যেন আপনি সব কিছু জেনে বসে আছেন। যান, ওসব বই-পড়া বিদ্যে ফলাতে হবে না আমার ওপর।

১০

হঠাৎ আমরা দেখলুম, একদল প্রাণী জল থেকে সার বেঁধে পাড়ে উঠে আসছে। দু'দশটা নয় অসংখ্য।

কাকদ্বীপের জেটিতে আমরা চারজন পা ঝুলিয়ে বসে আছি। আমরা চারজন পুরুষ বন্ধু। এখনো পুরো বিকেল হয়নি, অথচ রোদ নেই, একটু আগে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে—এখন মেঘও নেই আর, আকাশ ভরা নরম আলো। আমরা সিগারেট খেতে খেতে চারজনে জেটিতে বসে পা দোলাচ্ছিলাম।

নীচে এমন কুৎসিত কাদা যে তাকালেই গা ঘিন ঘিন করে। পা থেকে জুতো হঠাৎ খুলে পড়ে গেলে, সেটাকে আবার ঐ কাদায় নেমে তুলব কিনা এ নিয়ে গবেষণা করলুম কিছুক্ষণ। আমার পা থেকে চটি জুতো খুলে পড়ে গেলে আমি তুলতে রাজি ছিলুম না, এমনকি চশমা বা পকেট থেকে কলম পড়ে গেলেও না। অবশ্য ক্যামেরা বা ঐ ধরনের দামি জিনিস পড়ে গেলে আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়তে রাজি ছিলুম।

এখানে গঙ্গা ডায়মণ্ডহারবারের মতন সমুদ্রপ্রতিম বিস্তৃত নয়। মাঝখানে চর জেগে উঠে নদীকে দ্ভাগ করে দিয়েছে। সেই নতুন চরে ছোট ছোট চারা গাছ ভরে আছে, আমাদের সকলেরই ইচ্ছে হলো ঐ দ্বীপের একটা কোনো নাম দিয়ে একটা উপনিবেশ পত্তন করি। আমাদের সেই স্বাধীন রাজ্যের শাসনব্যবস্থা কি রকম হবে, তাই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, দ্যাখ দ্যাখ! কী আশ্চর্য!

প্রথমেই সাপের কথা ভেবে আমরা চমকে উঠেছিলুম। পরে আট চোখে আমরা জলের দিকে তাকালুম। জল পেরিয়ে কাদার ওপরে কি যেন কতগুলো জীব উঠে আসছে। একটা দুটো নয়, অসংখ্য সার বেঁধে। আমরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম, জীবগুলো মাথায় ভর দিয়ে দিয়ে কাদা দিয়ে হেঁটে আসছে। কুমীর আর কচ্ছপ ছাড়া আর তো কোনো প্রাণীর কথা শুনিনি—যারা জল থেকে উঠে পাড়েও স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে। ঝড় যখন মেঘ করে কই মাছও পাড়ে উঠে আসে জানি। এবং সে সব কই মাছ নাকি গাছেও ওঠে—শুধু গাজাখোরবাই তাদের দেখতে পায় অবশ্য। কিন্তু এরকম সার বেঁধে শত শত প্রাণীর জল ছেড়ে মাটিতে উঠে আসার দৃশ্য কখনো কল্পনাও করিনি।

প্রাণীগুলিকে বিকট দেখতে, কিন্তু আকারে ছোট বলেই ভয়াবহ নয়। দেড় আঙুল দু'আঙুল লম্বা, ট্যাংরা মাছের মতো আকার, কিন্তু মুখ শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়ো, অনেকটা ভাল্লুকের মতো—এবং কোনো ল্যাজ নেই। চোখ দুটো একেবারে মাথার ওপরে। আমরা আট চোখে ব্যগ্রভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইলুম।

কাদার মধ্যে সেই শত শত জলজ প্রাণী খেলা করছে, হেঁটে হেঁটে ঘুরছে। ওদের হাঁটা খুব মসৃণ নয়, মাঝে মাঝে বোকার মতো পিছলে পড়ে যাচ্ছে। কাদার মধ্যে অবশ্য পা পিছলে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু ওরা তো পা দিয়ে হাঁটছে না, হাঁটছে মাথা দিয়ে—বেশ দ্রুতগতিতে হাঁটতে চায়, অথচ যেন হাঁটা ঠিক অভ্যেস হয়নি এখনো। যেগুলো সদ্য জল থেকে উঠে আসছে সেগুলির গায়ে দেখতে পাচ্ছি শোল মাছের মতো চক্র কাটা। একটু বাদেই কাদায় ওদের চেহারা কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতির মধ্যে কোনোরকম অসামঞ্জস্য আমাদের সহ্য হয় না। জলে পাথর-ভাসা যেমন বিরক্তিকর, তেমনি জলের মাছ পাড়ে উঠে হাঁটাহাঁটি করবে, এটাও কম বিরক্তিকর নয়। এগুলো মাছ বা পোকা, তাই বা কে জানে! দেখতে মাছেরই মতো অনেকটা, কিংবা মাছ না হলেও বা কি। চিংড়ি মাছও তো মাছ নয়, পোকা। এ লবস্টার ইজ এ লেডি ফিস—কিন্তু লবস্টার লেডিও নয়, মাছও নয়। তবু মাছ ছাড়া যার ভাত রোচে না, সেইরকম অনেকেরই সবচেয়ে প্রিয় মাছ হচ্ছে চিংড়ি।

আশেপাশে কয়েকজন বেকার চাষাভুষো শ্রেণীর লোক ছিল নদীর পাড়েই, দু-তিনটে খড়ের ঘর—বোধ হয় সেখানকার বাসিন্দা। ডেকে জিজ্ঞেস করলুম, এগুলো কী বলতে পারো?

—সেগুলো তো মাছ! না-খাওয়া মাছ।

—না-খাওয়া মাছ মানে?

—ওসব মাছ লোকে খায় না। খায়ও বটে, ছোটজাতে খায়।

—তোমরা কী জাত?

—কৈবর্ত।

—ও, আচ্ছা। তা তোমরা খাও না কেন? মাছের এমন আকাল, আর এখানে দেখলুম—এরা হাজারে-হাজারে উঠে আসছে।

—ওসব নিচু জাতের মাছ! আমরা ওদের বলি, ডাক, ডাকমাছ। কেউ বলে ডাকু মাছ।

—ডাকমাছ কেন? ডাকনাম হলো কেন?

—কি জানি বাবু। আমরা মুখ্যু লোক কি আর ওসব জানি।

এ মাছের নাম আগে কখনো শুনিনি, কিন্তু 'নিচু জাতের মাছ' কথাটার মধ্যে যেন কিছুটা রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত পেলাম। অর্থাৎ এরা আর পুরোপুরি মাছ নয়, মাছের সমাজে অন্ত্যজ, মাছের বদলে স্থলজ প্রাণী হবার দিকেই ওদের ঝোঁক। বাদুড় যেমন পাখি নয় ওরাও তেমনি মাছ নয়।

আমরা চার বন্ধু তখন আর আকাশ দেখছি না, নদী দেখছি না, নবীন দ্বীপ দেখছি না, আমরা শুধু একমনে কুৎসিত কাদার ওপর সেই বিকট চেহারার

মাছগুলোর খেলা দেখতে লাগলুম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার দিব্যদর্শন হলো। আমার মনে হলো, ওরা আসলে টেরাডাকটিল আর ডাইনোসরদের বংশধর। সেই যেমন একদিন জল ছেড়ে প্রাণীরা উঠে এসেছিল মাটিতে, আমাদের প্রপূর্বপুরুষেরা, বিশাল বিশাল বৃক্ষের ছায়ায় তারা মাতামাতি করেছিল, পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের শব্দ উঠেছিল, এরাও তেমনি জল ছেড়ে উঠে আসতে চাইছে। কয়েক বছর পরেই হয়তো এরা গিরগিটি বা সাপ হয়ে ডাঙায় ঘুরবে।

ডাকমাছগুলো জল থেকে উঠেই কিন্তু আর জলের কাছাকাছি থাকছে না, সরে আসছে, গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কখনো বা পরস্পর মারামারি করছে। সেই মারামারি দেখায় আমরা নতুন মজা পেয়ে গেলুম। যেগুলো খুব বাচ্চা, সেগুলো ঘুরছে নির্ভয়ে, কিন্তু সমান চেহারার দুটো জোয়ান মাছ কাছাকাছি এসেই রুখে দাঁড়াচ্ছে। জল থেকে যখন উঠে আসছে, তখন মারামারি নেই, কিন্তু স্থলের ভিতরে যত আসছে ততই মারামারি বাড়ছে। যেন স্থলভাগের অধিকার নিয়ে লড়াই। পৃথিবীতে এখনো তিন ভাগ জল—জলের অধিকার নিয়ে ঝগড়া হয় না, কিন্তু স্থলের দখল নিয়ে যুদ্ধ চলে অনবরত, এটা ওরা কত তাড়াতাড়ি শিখে যাচ্ছে।

ভারী মজার সেই যুদ্ধের দৃশ্য। দুটো ছাগলের মতো মুখোমুখি গোঁ মেরে দাঁড়িয়ে যায়, ওদের ভাল্লুকের মতো বিকট মুখটা আরো ফুলে ওঠে, বিশাল হাঁ করলে ভিতরে একটা কালো গর্ত দেখা যায়, এক সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যপক্ষ বিদ্যুৎগতিতে সরে যায়।

আমরা চেঁচিয়ে উঠলুম, লাগ লাগ, লেগে যা! নারদ! নারদ! সাবাস নারদ কা বাচ্চা!

কে হারবে কে জিতবে এই নিয়ে আমরা এক-একজন এক-একটার পক্ষ নিয়ে বাজী ধরি। কখনো ওরা চার পাঁচ দিকে চার পাঁচ জোড়া লড়াই করছে, কোনটাকে দেখব, বুঝতে পারি না। ক্রমশ ওদের মধ্যে একটা তুমুল যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে একটা অন্যটাকে হারিয়ে একেবারে মেরে ফেলেছে। সেই সভ্যতার আদিকালে সমস্ত প্রাণীরা যেমন জল থেকে উঠে এসে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ধ্বংস হয়ে গেছে—এখানেও আমরা যেন সেই পুনরাবৃত্তি দেখতে পেলুম। জল থেকে ওরা উঠেছে এক সঙ্গেই ঝাঁক বেঁধে—তখন কোনো ঝগড়া নেই—কিন্তু কি আশ্চর্য, যতই ওরা বেশি পাড়ের দিকে আসছে ততই লড়াই লাগছে। তা হলে যুদ্ধ কি এই মাটিরই দোষ?

জোয়ারের জল আস্তে আস্তে বাড়তেই লড়াই ক্রমশ থেমে যায়। হেরে-যাওয়া মাছগুলো গর্তে ঢুকে যায়, কয়েকটা গুণ্ডা শ্রেণীর মাছ শুধু টহল দিতে থাকে। আমাদের তখন লড়াই দেখার নেশায় পেয়ে গেছে। আমরা আরো লড়াই বাধাবার

জন্য ওদের উত্তেজিত করি। হুস যা না, ওদিকে যা! ঐ যে ওদিকে! এই পেট-মোটা, ঐ ঘাড়-উঁচুটার কাছে যা না! ছোট ছোট ইঁটের টুকরো এনে আমরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওদের বিব্রত করার চেষ্টা করি। কিন্তু হঠাৎ মাছগুলো যেন উদাসীন হয়ে যায়। যেমন হঠাৎ লড়াই আরম্ভ করেছিল, তেমনি হঠাৎই আবার থেমে যায়। যেন বিকেলের এইটুকু সময় ওদের খেলাধুলো বা কুস্তি করার সময়। কিংবা হয়তো ওরা জেনে গেছে, জোয়ারে এক ঘণ্টা পরে এই কাদা জমির সবটুকুই ডুবে যাবে, সুতরাং জমির অধিকার নিয়ে আর মারামারি করে লাভ নেই।

কিন্তু মারামারি থেমে যাওয়া আমাদের একটুও পছন্দ হলো না। আমরা চারজন ছুটোছুটি করে বড়ো বড়ো ইঁটের টুকরো খুঁজে নিয়ে এসে অজানা আক্রোশে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলুম। ওদের গায়ে সহজে লাগে না, বা নরম কাদায় আছে বলে ইঁট লাগলেও ওদের আঘাত লাগে না। কিন্তু আমরা তখন হিংস্র হয়ে উঠেছি। ইঁট ফুরিয়ে যেতেই রাস্তা থেকেই খোয়া ভেঙে নিয়ে আসতে লাগলুম।

এমন সময় দূরে একটা গণ্ডগোল শোনা যায়। একটু দূরের খড়ের ঘরগুলোর পাশ থেকেই উত্তেজিত চিৎকার আর গালাগালির আওয়াজ। এক বন্ধু খুশিতে উদ্ভাসিত মুখে বললে, ওখানে মারামারি হচ্ছে, চল দেখতে যাই।

হাতের ইঁট ফেলে দিয়ে আমরা সেদিকে ছুটলাম! ওখানে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। দুপক্ষেই দু-তিনটি স্ত্রীলোক আর দু-তিনটে রোগা চেহারার পুরুষ, মুখে অকথ্য গালাগালি আর হাতে বাঁশের কঞ্চি। আন্দাজে বুঝলুম, এ বাড়ির বাচ্চা ছেলেকে ওবাড়ির বাচ্চা ছেলে মেরেছে, এই নিয়ে ঝগড়া শুরু, তারপর পারিবারিক কুৎসায় নেমে এসেছে। দূরে দাঁড়িয়ে আমরা বেশ উপভোগ করতে লাগলুম। একটু পরে যখন সত্যিই হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল, তখন হাসিমুখে আমরা চার বন্ধু পরস্পর চোখ টিপলুম। অর্থাৎ কোনপক্ষ জিতবে, কোন পক্ষ হারবে, এসো তাই নিয়ে বাজি ধরা যাক!

১১

বই কেনার বদলে আমি নতুন বন্ধুর সংখ্যা বাড়িয়ে চলি অনবরত। ফলাফল একই। নতুন বই কেনার মতন যদি যথেষ্ট অতিরিক্ত টাকাপয়সা না থাকে, তবে নিত্যনতুন বন্ধুর কাছ থেকে দু'একখানা করে বই হস্তান্তরিত করার সুযোগ পাওয়া যায়ই। অবশ্য সামান্য ছোট অসুবিধে এতে মাঝে মাঝে হয়, যখন সদ্য নতুন কোনো

বন্ধুর কাছ থেকে সবেমাত্র দু-দিনের কড়ারে একটি বই চেয়ে নিয়েছি, তখনই যদি কোনো পুরোনো দাগী বন্ধু এসে হাজির হয়ে বলে, কি রে, আমার অমুক বইটা ফেরৎ দিলি না? এই নিয়ে তুই আমার একুশখানা বই ইত্যাদি। সেই সমস্ত অস্বস্তিকর অবস্থা কাটাবার জন্য একটা কিছু তাৎক্ষণিক উপায় খুঁজে নিতে হয়।

অপরের বই চেয়ে এনে ফেরৎ না-দেবার ব্যাপারে আমার কোনো গ্লানি নেই। কারণ, এই সার সত্য আমি জেনে ফেলেছি, প্রত্যেক বইয়েরই একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে। লক্ষ্মীর মতোই, বই জিনিসটাও বেশ চঞ্চল, সে কখনো এক লোকের বাড়িতে বেশিদিন থাকতে চায় না। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোকের নাম লেখা বইও আছে আমার বাড়িতে, সেগুলো কি করে যে এল, তা আমি বিন্দুমাত্র জানি না।

আবার নতুন আলাপ হওয়া কোনো লোকের বাড়িতে প্রথম দিন গিয়েই আমি দেখতে পেয়েছি আমার নাম লেখা বই আলমারিতে বিরাজমান। এই এরকমই নিয়ম।

কিন্তু চেয়ে-আনা বই সাধারণত একটু পুরোনো হয়। প্রথম নতুন চটকা বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে, গন্ধ শুঁকতে আমার ভালো লাগে। এজন্য বইয়ের দোকানে ঘোরাঘুরি করার স্বভাব হয়ে গেছে আমার। আমার এক বন্ধু সপ্তাহে দাঁড়িয়েই সাপ্তাহিক পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাসগুলো পড়ে নিতেন। আমি কোনো বড়ো দোকানে ঢুকে দশ বারখানা নতুন বই নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর একটা দুষ্প্রাপ্য বই চেয়ে বসি। সেটা না পেয়ে, খুবই দুঃখিত হবার ভান করে দোকান ছেড়ে চলে আসি।

বই কেনা না হলেও, বইয়ের দোকানে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন সব টুকরো সংলাপ বা দৃশ্য শুনতে বা দেখতে পাই, তার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

যেমন, একদিন দেখেছিলাম, একটি তন্বী যুবতীর সঙ্গে একটি ছিপছিপে চেহারার যুবক এল দোকানে। তরুণীটি কিছুটা চঞ্চলা, তা ছাড়া সে নেবে শাড়ি পরেছে বলে সমস্ত শরীরময় চঞ্চলতা যুবকটি সে তুলনায় বেশ ধীর। কিছু বই উল্টেপাল্টে দেখার পর যুবকটি বলল, তোমাকে আজ একটা কবিতার বই কিনে দিই।

—ধুৎ কবিতা!—এই কথাটা বলে যুবতী এমন একটা বিদ্রূপের ভঙ্গি তুলল ঠোঁটে যে, আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

অসীম অবজ্ঞার সঙ্গে উল্টানো সেই স্ফুরিত অধরে এমন একটা সৌন্দর্য ছিল, যার তুলনায় পৃথিবীর সব কবিতাই তুচ্ছ, (সেই মুহূর্তে)। বস্তুত, কোনো

মেয়ের মুখে অমন নিখুঁতভাবে কবিতার সমালোচনা, আমি এর আগে বা পরে আর শুনিনি। দেখিনি বলাই বেশি সঙ্গত।

শেষ পর্যন্ত সেই যুবতীটি কি বই নিলেন—তা অবশ্য বলাই বাহুল্য। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, যদি বুঝতে না পেরেও থাকেন, তবু আমি বলব না।

আর একদিন, একটি যুবতী একা এসেছেন। মাথায় সিদুর দেখলেই মনে হয়, নতুন কয়েক মাস মাত্র বিয়ে হয়েছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বললেন, আচ্ছা, ইয়ে, মানে ইয়ের সেকেণ্ড পার্টটা আছ ?

দোকানের একজন কর্মচারী বললেন, কোন বইটার সেকেণ্ড পার্ট ?

—ইয়ে মানে ঐ যে সেকেণ্ড পার্ট।

—কোন বইয়ের ?

যুবতীর মুখ নম্র লজ্জায় ভরে গেল। অপর একজন কর্মচারী বললেন, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। তিনি ভিতর থেকে একটা বই এনে দেখিয়ে বললেন, এইটা তো ?

মেয়েটি সম্মতি জানিয়ে মুখ নিচু করলেন। তারপর নিচু মুখ করেই হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে টাকা বার করতে অনেকটা সময় লাগল। মেয়েটি বই নিয়ে বেরিয়ে যেতেই একজন কর্মচারী অপরজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি করে বুঝলি —এই বইটারই সেকেণ্ড পার্ট চেয়েছিল ? অপরজন মুচকি হেসে বললেন, মুখ দেখেই বুঝতে হয়! মাথায় নতুন সিঁদুর, মুখে লজ্জা—সেকেণ্ড পার্টেই তো সন্তান পালন বিষয়—

আর একটি দোকানে— সে দোকানে ইংরিজি-বাংলা সব রকম বই-ই পাওয়া যায়। একজন মধ্যবয়স্ক লোক ঢুকে জিজ্ঞেস করল আপনাদের কাছে পিকুইক পেপার্স আছে ? দোকানের কর্মচারী উদাসীন ভঙ্গি করে বলল, আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছে ভোলানাথ কিংবা অন্য কাগজের দোকানগুলোয় খোঁজ করুন। এটা বইয়ের দোকান!

—পূরবী আছে ? সেদিন দোকানে অনেক ভিড়, আমিও সেদিন যা থাকে কপালে আজ একটা কিনেই ফেলব—এই রকম ঠিক করে ফেলে বহু বই ঘাঁটাঘাঁটি করার সুযোগ নিচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে। দোকানে আমাকে বাদ দিয়েও চার-পাঁচজন, কাউন্টারের এক কোণে একটি পূর্ণ উদ্ভাসিত যুবতী নানা বই দেখছেন, খুব মনোযোগ দিয়ে আমার ডান পাশে একটি যুবক রবীন্দ্রনাথের বই দেখছিলেন। হঠাৎ যুবকটি জিজ্ঞেস করলেন, পূরবী আছে ?

দোকানের কর্মচারী একটু ইতস্তত করে বললেন, না, ক্ষণিকা কিংবা পলাতকা আছে—দেব?

—কেন, পূরবী নেই?

কর্মচারীটি আরো ইতস্তত করে বললেন, না, মানে—

—আমার যে পূরবীই দরকার!

কর্মচারীটির মুখখানা কাতর হয়ে এল। যুবকটি বিরক্তভাবে দোকান ত্যাগ করলেন! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি যুবক ঢুকে বললেন, ইস, পূরবী, তোমাকে অনেক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। বড্ড দেরি হয়ে গেল—

কাউন্টারের কোণে দাঁড়িয়ে যুবতীটি এবার মুখ তুলে চাপা কৌতুকে দোকানের কর্মচারীকে বললেন, একেও বলে দিন না, পূরবী নেই। বলে দিন, এখন শুধু ক্ষণিকা কিংবা পলাতকা আছে!

এফস্কট ফিটজেরাল্ডদের সঙ্গে দেখা হয় কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়। একজন বৃদ্ধ লোককে দেখলুম একদিন, এককালে খুব লম্বা ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন বলা যায়, এখন কিছুটা ন্যুব্জ ও শীর্ণ চেহারার, মাথার চুল ধপধপে সাদা। চোখে পুরু চশমা। বললেন, অমুক বইটা আছে?

—না, আমাদের কাছে নেই।

—আর, পাওয়া যায় না?

—যায় হয়তো। আমরা রাখি না। কেউ চায় না আজকাল।

—কেউ চায় না, না?

বৃদ্ধ নিচু গলায় আপন মনেই বললেন, বইটা আমারই লেখা। আজকাল আর কেউ পড়তে চায় না, না? এক সময় কিন্তু অনেকে চাইত। 'ভারতবর্ষে' আমার বই বেরিয়েছে ধারাবাহিক, শরৎবাবু প্রশংসা করেছিলেন—এখন কেউ পড়তে চায় না! শরৎবাবুর বই তো এখনো পড়ে।

আমি পরে বইটি খুঁজে নিয়ে পড়ে দেখছিলাম। সত্যিই বইটির এক সময় খুব চাহিদা ছিল, উনিশশো তিরিশ সালে বইটির চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত বেরিয়েছিল!

এরই বিপরীত ধরনের আর একটি লোককে দেখেছিলাম—কোনোদিনও ভুলব না তাকে। একটি বইয়ের দোকানের এক কোণে একটি মলিন পোশাক-পরা প্রৌঢ়কে দোকানের কর্মচারী বার বার জিজ্ঞেস করছেন, কী চাই আপনার? লোকটি হাত তুলে প্রতীক্ষার ভঙ্গিতে বলছিলেন, পরে-পরে—আগে একটু ফাঁকা হোক!

লোকটির পরনে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি, পায়ে কেডস জুতো। হাতে একটি মোটা ফাইল। লোকটি নির্বিকার হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে বহুক্ষণ প্রায়। একটু ক্রেতার ভিড় হালকা হতে তিনি বললেন, আমি একটি পাণ্ডুলিপি এনেছি। আপনারা যদি প্রকাশ করেন—

দোকানের কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মাপ করবেন, আমরা নতুন লেখকের বই ছাপি না।

লোকটি সামান্য হেসে উত্তর দিলেন, হুঁ—আমি তো আর নতুন লেখক নই। এই বয়েসে কি আর নতুন করে লেখা শুরু করা যায়? আমি ইতিপূর্বে সাতখানি গ্রন্থ লিখেছি। ন্যাগ্রোধন্যায়ের টীকা, বাসুদেব চরিত, দক্ষযজ্ঞের গূঢ় কথা...

—ছাপা হয়েছে সেসব বই?

—না, এখনো একটিও ছাপা হয়নি। এবার একটি একটি করে ছাপা শুরু করব। আমার শ্রেষ্ঠ বইটিই এনেছি। আপনাদের জন্য।

—মাপ কবরেন, ওসব বই আমরা ছাপি না।

—আহা, কি সব বই বুঝলেন কি করে? এখনো তো পড়েনই নি! আমার এই গ্রন্থটির নাম 'অন্তরীক্ষ রহস্য'। চোখে দেখা জগতের বাইরে যে বিশাল জগৎ —সে সম্পর্কে আমার দীর্ঘজীবনের যে উপলব্ধি, তাই লিখেছি। ছাপালে প্রায় চার শো কি পাচশো পাতা হবে। এই গ্রন্থ পড়ে মানুষ অন্তর্জীবনে শান্তি পাবে।

—ওসব জ্ঞানের কথা আর কে আজকাল পড়তে চায়? আপনি অন্য জায়গায় দেখুন।

—অন্য কোন প্রকাশালয় এই প্রকার গ্রন্থ ছাপান?

—সত্যি কথা যদি শুনতে চান, তবে বলে দিচ্ছি কেউ ছাপবে না। ওসব পণ্ডিতি বই নিজের খরচেই ছাপান আজকাল সবাই। বছরে দশখানা বিক্রি হয় কি না হয়।

—না, না, এ সেই প্রকার বই নয়। এতে একটিও হাল্কা কথা নেই। প্রমাণ এবং ব্যুৎপত্তি ব্যতীত একটি কথাও লিখিনি। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমি এসব বই ছাপার ব্যয় কি করে সঙ্কুলান করব? আপনারা পড়ে দেখুন!

—পড়ে দেখে আমরা কি করব? বললুম তো।

—আহা পড়েই দেখুন না, বইতে যদি কোনো ভুল থাকে, তথ্যের কোনো দোষ থাকে, তা হলে আমি ছাপার জন্য মোটেই পীড়াপীড়ি করব না। পড়ে দেখুন আগে।

—বলছি তো, আমাদের পড়ে কোনো লাভ নেই। এসব বই চলে না, আমরা ছাপতে পারব না।

—পড়বেনও না?

—না। মাপ করবেন। আচ্ছা নমস্কার।

প্রৌঢ়টি রক্তহীন মুখে আবার বললেন, পড়েও দেখবেন না? দীর্ঘ সাত বৎসরের পরিশ্রমে লিখেছি, তা শুধু একবার পড়ে দেখতেও আপত্তি! সাত বছর

দিন-রাত্রি খেটে যা লিখেছি—তা সবই ব্যর্থ? আমার মধ্যম কন্যা সম্পূর্ণ বইটা কপি করে দিয়েছে, মুক্তার মতন তার হস্তাক্ষর, সে লেখা পড়ে দেখতেও আপত্তি! থাক,...আচ্ছা, এক গ্লাস জল খাওয়াবেন?

দোকান থেকে ওঁকে এক গ্লাস জল দেওয়া হলো। প্রৌঢ়টি লোভীর মতন সমস্ত জল যেন শুষে খেয়ে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে ফাইলের দড়ি বাঁধতে লাগলেন আবার। বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগলেন, আর শোনা গেল না। ফাইল বাঁধা হলে সেটা হাতে নিয়ে দোকান ছেড়ে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। হঠাৎ ফাইলটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। শশব্যস্তে ঝুঁকে পড়ে ফাইলটা কুড়িয়ে নিয়ে ধুলো ঝাড়তে লাগলেন। আদর করার মতো আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে ধুলো ঝাড়ছিলেন তিনি। সেই সময় আমি তাঁর মুখের দিকে আবার তাকালাম।

সে রকম অপমান ও দুঃখে কুঁকড়ে-ওঠা মুখ একবার দেখলে এ-জীবনে আর ভোলা যায় না।

১২

আমাদের ইস্কুলের থিয়েটারে যে ছেলেটা প্রতাপাদিত্যের পার্ট করেছিল, তার সঙ্গে এখনো আমার প্রায়ই দেখা হয়।

ক্লাস টেনে উঠে সেবার এমন থিয়েটার করেছিলাম যে, মাস্টারমশাইরা নাকি তার স্মৃতি এখনো ভোলেননি। এখনো ক্লাসে পড়াতে পড়াতে তাঁরা বলেন, হ্যাঁ, নাইনটিন ফিফটির ব্যাচের ছেলেরা ছিল বটে সত্যিকারের, যেমন পড়াশুনোয়, তেমন অন্যান্য অ্যাকটিভিটিতে।

শিক্ষামন্ত্রীর ভাইপো পড়ত আমাদের ক্লাসে, সুতরাং স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী আমাদের থিয়েটারে চিফ গেস্ট হয়েছিলেন, প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় বিশ্বনাথ এমন মার-মার কাট-কাট অভিনয় করেছিল যে, হাততালির পর হাততালি এবং দু'খানা পদক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল ওর নামে।

আমি অবশ্য ভিড়ের দৃশ্যে একবার মাত্র মঞ্চে এসে কোরাসে 'জয় মহারাজের জয়' এইটুকু মাত্র বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু ঐ ভিড়ের দৃশ্যের সামান্য পার্ট পেয়েই আমি খুশি, কারণ অভিনয়ের শেষে যখন গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিল, তাতে তো আমিও দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম, এবং ঠেলেঠুলে এসে দাঁড়িয়েছিলাম একেবারে শিক্ষামন্ত্রীর পাশেই।

বিশ্বনাথ আমাদের ক্লাসেও হিরো হয়ে রইল। পড়াশুনোয় তেমন ভালো ছিল না, কিন্তু চেহারাখানা ছিল সুন্দর, ফর্সা রং কোঁকড়ানো চুল, কথা বলার সময় বেশ গলা কাঁপাতে পারত। শিক্ষামন্ত্রী ওর কাঁধ চাপড়ে প্রশংসা করেছিলেন বলে মাস্টারমশাইরা বিশ্বনাথকে বেশ সমীহ করে চলতেন।

ফার্স্টবয় সুপ্রকাশদের বাড়িতে আমাদের ক্লাব ছিল, বিকেলে সেখানে আমরা জড়ো হতুম, সুপ্রকাশের বোন শিবানী আমাদের তেমন গ্রাহ্যই করত না বটে, কিন্তু বিশ্বনাথকে বলত, বিশুদা। একদিন বিশ্বনাথ একটা নীল কাগজ দেখিয়ে আমাকে বলেছিল, এটা কি জানিস? লাভ লেটার!

আমি বললুম, দেখি, কে লিখেছে? বিশ্বনাথ ছোঁ মেরে কাগজটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পকেটে ভরল।

আমি বললুম, কে লিখেছে বল না। বিশ্বনাথ এমনভাবে চোখ টিপল, যার মানে হয়, শিবানী। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম।

পুজোর ছুটির পরও আর একটা থিয়েটার করার জন্য বিশ্বনাথের খুব উৎসাহ ছিল। কিন্তু তখন সামনেই টেস্ট পরীক্ষা বলে মাস্টারমশাইরা রাজি হলেন না।

টেস্টে কোনোরকমে অ্যালাওড হলেও ফাইন্যালে বিশ্বনাথ পাশ করল না।

তারপর আমরা আলাদা আলাদা কলেজে ছিটকে গেলুম। ইস্কুলের বন্ধুদের অনেকের সঙ্গেই আর যোগাযোগ রইল না। প্রথম কয়েক বছর ইস্কুলের কোনো বন্ধুর সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হলে বিষম আনন্দ হতো, পুরোনো গল্প, ক্লাসে কে কবে কি ইয়ার্কি করেছিল সেইসব। তারপর যথা নিয়মে, কারুর সঙ্গে দেখা হলে, কী খবর, ভালো তো, আচ্ছা চলি।

আমি আর সুপ্রকাশ এক কলেজে পড়তুম, আমাদের বন্ধুত্ব টিঁকে গেল, শিবানীও আমাকে ওর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নীলুদা বলেই ডাকত এবং লাভ লেটার না লিখলেও একদিন আমার সঙ্গে একা সিনেমায় গিয়েছিল। বিশ্বনাথ দ্বিতীয়বার ম্যাট্রিক ফেল করে পড়া ছেড়ে দেয়।

একদিন সুপ্রকাশ আর আমি আসছি, পথে বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা। সুপ্রকাশ বলল, এই যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, কেমন আছেন?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কি রে বিশে, কেমন আছিস?

বিশ্বনাথ একটু লাজুকভাবে হাসল। কি রকম একটা তফাৎ তৈরি হয়ে গেছে, স্কুলে পড়ার সময় বেশ একটা আত্মবিশ্বাস এবং অহংকার ছিল ওর, আমাদের সঙ্গে কথা বলত বেশ একটু উঁচু থাকে। এখন ও ম্যাট্রিকে ফেল করেছে এবং আমরা থার্ড ইয়ারে পড়ি—শুধু এইজন্যই ওর মুখে একটা হীনমন্য লজ্জা ফুটে উঠেছে। তবু খানিকটা জোর করে হেসে বলল, আর আমার লেখাপড়া ধৈর্যে

কুলোলো না। চাকরিতে ঢুকে গেলুম।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কী চাকরি করছিস রে? খাওয়া আমাদের—

—বাবার বন্ধুর এক চায়ের কোম্পানি আছে। সেখানে বসছি। কি খাবি চল না।

বছরখানেক পর বিশ্বনাথের সঙ্গে আবার দেখা। পোশাক ও মুখ খানিকটা মলিন। হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। বেশ শৌখিন ছেলে ছিল বিশ্বনাথ, ইস্কুলে পড়ার সময়ে ওর পকেটে চিরুনি থাকত, রুমালে সেন্টের গন্ধ পেতুম। জিজ্ঞেস করলুম, কি বিশে? কি খবর?

ও বলল, আর ভাই বলিস না! ভাগ্যটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল—বাবা মারা গেলেন, সেই চায়ের কোম্পানিটাও উঠে গেল। পরীক্ষায় গাড্ডু মারলুম, এখন আবার গাড্ডায় পড়েছি।

—কী করছিস এখন?

—তুই একটা লাইফ ইনসিওর করবি? আমি ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়েছি।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, আমার আবার লাইফের দাম কিরে যে আবার ইনসিওর করাব? তা তুই সিনেমা কিংবা থিয়েটারে ঢুকলি না কেন?

—দূর দূর, ধরাধরি ছাড়া ওসব লাইনে ঢোকা যায় না। ঘোরাঘুরি করেছিলুম কিছুদিন। আমি নাকি বেঁটে, তাই ওদের পছন্দ হয় না। পাড়ার ক্লাবে অবশ্য এখনো থিয়েটার করছি।

তাকিয়ে দেখলুম, সত্যিই, স্কুলে পড়ার সময় বেশ সুদর্শন ছিল বিশ্বনাথ, কিন্তু তারপর আর লম্বা হয়নি। কি রকম যেন চ্যাপ্টা ধরনের চেহারা হয়ে গেছে। আমি বললুম, জানিস গত মাসে শিবানীর বিয়ে হয়ে গেল—আমাদেরই কলেজের এক প্রফেসারের সঙ্গে—

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বনাথ বলল, তাই নাকি? ভালোই তো—আমিও একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি, শিবানীর চেয়ে ঢের সুন্দরী।

তারপর এই পনেরো ষোলো বছরে কত কি বদলে গেল। সবচেয়ে বেশি বদলাল বিশ্বনাথ। ওর উপর যেন শনির কু-দৃষ্টি পড়েছিল, ক্রমশ ও নীচে নামতে লাগল। জরির পোশাক ও পালকের মুকুট পরা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় দেখেছিলাম ওকে, ভিড়ের দৃশ্যের মধ্যে থেকে আমি ওর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিলাম! অথচ, ওর সঙ্গে আমার দেখা হলেই আজকাল ওর মুখখানা কাচু-মাচু হয়ে যায়, দু'-একটা কথা বলেই সরে পড়ে। আর দেখাও হয়! কলকাতা শহরটাই এমন—যার সঙ্গে দেখা হওয়া খুবই দরকার, তার সঙ্গে পথে-ঘাটে হঠাৎ কিছুতেই দেখা হবে না। আর যার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো দরকার নেই, দেখা

হলেই বরং অস্বস্তি, সেই পাওনাদার কিংবা ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখা হবেই।

কখনো বিশ্বনাথকে দেখি বইয়ের ক্যানভাসার হয়েছে। ও বললে, ধুৎ, বড়ো লোকেদের সঙ্গে চেনাশুনো না থাকলে ইনসিওরেন্সের এজেন্সিতে কোনো লাভ নেই। শুধু শুধু মান নষ্ট! তার চেয়ে এই বইয়ের ব্যাবসা ধরেছি, অনেক সম্মানজনক! এর মধ্যে আবার বিয়ে করে মুস্কিলে পড়ে গেছি এমন! —কখনো ওকে দেখি বাড়ির দালাল হিসেবে, কখনো কোনো কোম্পানির বিল কালেক্টর।

হাতিবাগান বাজারে পাখির খাঁচা কিনতে গিয়েছিলাম। রবিবারের বাজারে বেশ ভিড়, অনেকক্ষণ ধরে পছন্দ-টছন্দ করার পর, দোকানদারকে দাম দিতে গিয়ে দেখি, বিশ্বনাথ। আমাকে ও প্রথমে লক্ষ্যই করেনি, আমি বললুম, কি রে বিশে!

আমাকে দেখে ওর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, কবে এই দোকান করলি? ও বলল, দাঁড়া, এই খদ্দেরকে একটু ছেড়ে দিই। তুই এই টুলটায় বোস না। চা খাবি?

ময়লা ধুতি ও ফতুয়া পরে আছে। কত বদলে গেছে ওর চেহারা! সবচেয়ে বদলেছে ওর মুখ। জীবিকার যত নিচু স্তরে ও নেমেছে, ততই ওর মুখে একটার পর একটা পর্দা পড়েছে, কি রকম তেলতেলে, অকিঞ্চিৎকর, যে-কোনো মানুষের মতন মুখ, তাতে খানিকটা দীনতা ও লজ্জা মেশানো। ছেলেবেলার সেই অহংকার একটুও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ও বলল, শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ব্যাবসা শুরু করলুম। দেখলুম ওসব উঞ্ছবৃত্তি করে কোনো সুরাহা হয় না। তোরা হয়তো আমার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পাবি—

আমি বললুম, পাগলের মতন কথা বলছিস কেন? দোকান করেছিস তাতে লজ্জার কি আছে?

নিচু গলায় বিশ্বনাথ বলল, হ্যাঁরে, শিবানীর কোন পাড়ায় বিয়ে হয়েছে রে? ও যদি কখনো এখানে আসে, আমার সত্যি লজ্জা করবে।

আমি বললাম, ধ্যাৎ তোর ওসব ছেলেমানুষী এখনো আছে? জীবন যাকে যেটুকু দিয়েছে—এর মধ্যে লজ্জার কি আছে? বেচে থাকাটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। তুই তো কিছু অসম্মানের কাজ করছিস না!

বিশ্বনাথ যদি উল্টে আমাকে প্রশ্ন করত, তুই নিজে যদি এ অবস্থায় পড়তিস, তা হলেও কি এসব বড়ো বড়ো কথা বলতে পারতিস? কিন্তু এরকম প্রশ্ন করার সাহস ওর আর নেই।

বরং ও আমার খাঁচার দাম নিতে চাইল না—এও আরেক দীনতা, গলার

আওয়াজ মিনমিনে করে ও বন্ধুত্ব দেখিয়ে আমার সমান হতে চাইল। আমি জোর করে ওকে টাকা গুঁজে দিয়ে চলে এলাম।

সরস্বতী পুজোর সময় হাতিবাগান বাজারে ধুমধাম করে উৎসব হয়। দোকান কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে সিরাজদ্দৌল্লা নাটক হচ্ছে, এত ভিড় যে রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ হবার উপক্রম। কি এক অজানা কৌতূহলে আমি ভিড় ঠেলে একবার নাটক দেখার জন্য উঁকি দিলাম—স্বয়ং সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় অভিনয় করছে বিশ্বনাথ। জরির পোশাক, মাথায় পালকের মুকুট। কি অহংকারী মুখ এখন বিশ্বনাথের, কি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর, সমস্ত মঞ্চ জুড়ে দর্পিত পদভারে ও ঘুরছে। ঘন ঘন হাততালি। দেখে আমার এমন ভালো লাগল!

মানুষের কোথাও না-কোথাও একটা মহিমার আশ্রয় আছে। এই কয়েক ঘন্টার জন্য বিশ্বনাথ অপরিমিত সুখী। মুখের পর্দা সরে গেছে, গলার আওয়াজে ফিরে এসেছে আত্মবিশ্বাস। আমি আগেও ভিড়ের দৃশ্যে ছিলুম, এখনো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলুম।

১৩

চৌরাস্তার মোড়ে মেজমামার সঙ্গে দেখা। চোখাচোখি হতেই উনি নিঃশব্দে দাঁড়ালেন। কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়েই রইলেন। যেন কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি একটু আগে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিলুম যে-গলায়, এখন সেই কণ্ঠস্বর বদলে কৃতার্থ স্নেহভাজনের মতো নম্র স্বরে জিজ্ঞেস করলুম, কেমন আছেন মেজমামা? বাড়ির সবাই ভালো আছেন?

উনি সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, হ্যাঁ। যেন কিছু একটার প্রতীক্ষা করছেন। আমি তো জানি কিসের প্রতীক্ষা, কিন্তু না-বোঝার ভান করে দাঁড়িয়ে রইলুম। দেখা যাক না, কি হয়।

কি রকম বিসদৃশ দৃশ্য, রাস্তায় মাঝখানে দুজনে দাঁড়িয়ে আছি, কোনো কথা নেই। মেজমামার মুখে প্রতীক্ষা, আমার মুখে কিছুই না। ব্যাপারটা যখন সত্যিই বিসদৃশ হয়ে এল, তখন মেজমামা চলার ভঙ্গি করে ঈষৎ অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, এবার বিজয়ার পর বাড়িতে এলি না? নাকি তোরা ওসব প্রণাম-ট্রণামের পাট তুলে দিয়েছিস?

একটু আগেই পুরোনো ইস্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতমশাইকে দেখে পথের ওপরেই টিপ করে প্রণাম করেছি। এখনো মেজমামার কাছে ও কাজটা চট করে

সেরে নিতে পারতুম। কিন্তু আমি খুব বিনীতভাবে বললুম, না, প্রণাম করতে আমার খুবই ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমি সবাইকে প্রণাম করি না।

মেজমামা বোধহয় আমার কথাটা ভালো করে শুনতে পাননি, থেমে গিয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন, বাবাকেও তো প্রণাম করতে যাসনি।

—ঐ যে বললুম, আমি আর আজকাল সবাইকে প্রণাম করি না!

—কি ?

মেজমামা থমকে গিয়ে বিষম অবাক হয়ে তাকালেন। ব্যাপারটা বোধহয় বিশ্বাসই করতে পারলেন না। উনি কত আমায় ঘুড়ি ওড়াবার জন্য পয়সা দিয়েছেন, একবার সঙ্গে করে পুরীতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন আমায়, চাকরির জন্য তিন জায়গায় চেষ্টা করেছেন...সেই কৃপাধন্য আমি হঠাৎ ওঁকে অপমান করার চেষ্টা করব, উনি যেন বিশ্বাসই করতে পারেন না। অত্যন্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেন আমি প্রণাম করতে পারছি না এই রকম অসহায় আমার মুখের চেহারা। খুবই লাজুকভাবে মাথা নিচু করে হাতেব নখ খুঁটতে খুঁটতে আমি বললুম, আপনারা কেউ আমার ছোটকাকার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে আসেননি তো, সেই জন্যে আমি আপনাদের প্রণাম করব না ঠিক করেছি।

—বমেশের বিয়েতে যাইনি তার সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক।

—ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়নি। আমার ছোটকাকা তাঁর অধ্যাপকের মেয়েকে বিয়ে করেছেন, অন্য জাত, তাই আপনারা আসেননি!

—তোর পছন্দ-অপছন্দে কি আসে-যায়।

—কিছু আসে-যায় না। কিন্তু কাকে আমি প্রণাম করব না-করব তা তো আমিই ঠিক করেছি। যাদেব ব্যবহার আমার কাছে অশ্রদ্ধেয় মনে হবে, তাঁদের প্রণাম করব না।

—জাত না মেনে বিয়ে করাটা বুঝি খুব শ্রদ্ধার কাজ ?

আমি অবাক হয়ে বললুম, জাত তো আলাদা নয়। সবাই তো হিন্দু। এক সময় এদের আলাদা আলাদা বর্ণ বলা হতো বটে!

—ওসব তোরা না মানলে কি হয়, সংস্কার ছাড়া এত সহজ নয়। বাবার অমত ছিল বলেই আমরা যাইনি। বাবা বুড়ো মানুষ—

—আপনার বাবা কত বুড়ো, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেয়েও বয়স বেশি ? না, না, আমি এমন অসম্ভব বলছি না যে, বিদ্যাসাগরের আদর্শ সবাই মেনে নেবে —দেশের ব্যবস্থা এমন হয়েছে। কিন্তু আপনার বাবা অর্থাৎ আমার দাদামশাই গবেষণা করে তিনটে ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট পেয়েছেন। কলম্বোতে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন একসময়। তিনিও এসব যদি না বোঝেন, তবে সাধারণ লোকে

কি করে বুঝবে, বলুন? কারুকে না কারুকে তো এসব বাজে সংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে? দাদামশাই কি জানেন না যে বাংলা দেশের এসব জাত-ফাতের ব্যাপারগুলো একেবারে ভুয়ো! এক সময় যে-যা পেরেছে নামের সঙ্গে ইচ্ছে মতন পদবী জুড়ে দিয়েছে।

—বাজে বকবক করিস না! খুব পণ্ডিত হয়েছিস! জাতের সংস্কার সব দেশেই মানে, ইউরোপ আমেরিকাতেও—

—তা জানি। হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে কিংবা ইহুদীর সঙ্গে খ্রিষ্টানের, এমনকি খ্রিষ্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক আর প্রটেস্টান্টদের মধ্যে বিয়ে এখনো অনেক শিক্ষিত লোকও মানে না, কিন্তু এ হলো ধর্মবিশ্বাসের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য, কায়স্থ আর সুবর্ণবণিক—এদের ধর্মবিশ্বাস কি আলাদা? একই আচার, একই তীর্থ, ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের সেরকম একটুও তফাৎ আছে? আপনি বলুন?

মেজমামা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, খুব বড়ো বড়ো কথা শিখছিস না? নিজের মামাকেও জ্ঞান আর উপদেশ দিতে আসিস! তুই প্রণাম করতে এলেই বা নিচ্ছে কে?

আমি অত্যন্ত আহতভাবে বললুম, মেজমামা, আপনি রাগ করলেন? আমি কিন্তু মোটেই আপনার মনে আঘাত দিতে চাইনি। আমার আর কি বিদ্যেবুদ্ধি আছে বলুন! নিজস্ব কিছুই নেই। এ যা বললুম, সবই তো সাধারণ বই মুখস্থ-করা কথা! যেসব বই ইস্কুলে-কলেজে পড়ানো হয়, যেসব বই আপনি পড়েছেন আমিও পড়েছি...আপনি যেসব ভুলে গেছেন ইচ্ছে করে, আমি মনে রেখেছি—এই আমার দোষ!

—যা যাঃ! অসভ্য অভদ্র, বাউণ্ডুলে বিটনিক—

ঘরে ঢুকে দেখলুম বাবার জ্যাঠতুতো ভাই, অর্থাৎ আমার জ্যাঠতুতো জ্যাঠামশাই খাটে পা ঝুলিয়ে বসে টপাটপ নারকেল নাড়ু ঠেসে যাচ্ছেন। খাটের কাছাকাছি বয়েস, ঈষৎ মেদবৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু স্বাস্থ্য টসকায়নি। আমাকে দেখেই স্থূল পা দু'খানি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, বসেই প্রণাম কর। কোলাকুলি করতে হবে না, আর উঠতে পারি না। এইখান থেকেই আশীর্বাদ করছি!

আমি মজা করার জন্য হাসতে হাসতে বললুম, কিন্তু আপনাকে ত আমি প্রণাম করব না!

—কেন রে ব্যাটাচ্ছেলে, প্রণাম করবি না কেন?

—আপনাকে কেন প্রণাম করব বলুন!

—সে কিরে? সম্পর্ক ভুলে গেলি নাকি? অ বৌমা, এ ছেলেটা কি আত্মীয়স্বজনকে একেবারে ভুলে বসে আছে নাকি?

আমি বেশ প্রফুল্লভাবে হাসতে হাসতেই বললুম, না, জ্যাঠামশাই, সম্পর্ক ভুলব কেন? কিন্তু আপনাকে প্রণাম করি কি করে, আপনি তো ব্রাহ্মণ নন!

—অ্যাঁ? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোর? তোর বাপ যখন ব্রাহ্মণ ছিল —তখন আমি ব্রাহ্মণ নই?

—উহুঁ! আপনি তো আপনার ছেলের সঙ্গে এক শূদ্রের মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। তাহলে আর ব্রাহ্মণ রইলেন কি করে?

আমার জ্যেঠতুতো জেঠা এবার ঘর ফাটিয়ে হাসলেন। তারপর বললেন, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি! তোরা আজকালকার ছেলে হয়েও এসব জাত-ফাত মানিস নাকি? আমরা বুড়ে হয়েও এসব ছাড়তে পারলুম—

আমি ঘাড় চুলকে বললুম, একটু মানি এখনো। আপনার কন্ট্রাক্টারির ব্যাবসা —আপনি ব্যবসার সুবিধার জন্যে গভর্নমেণ্টের এক শূদ্র অফিসারের কুৎসিত মেয়ের সঙ্গে জোর করে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। বলুন, এটা কি ব্রাহ্মণের কাজ হলো?

জ্যেঠামশাই এবার হঠাৎ পা গুটিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন। তারপর রুক্ষ গলায় বললেন, ব্যাবসার সুবিধার জন্য ছেলের বিয়ে দিয়েছি, এ কথা তোকে কে বলেছে?

—কাগজেই বেরিয়েছে। আপনার টেণ্ডারের রেট বেশি হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে কনট্রাক্ট দিয়েছে—কাগজওয়ালারা এ খবর ফাঁস করে দিয়েছে!

—কাগজওয়ালাদের মুখ ঠিক বন্ধ হয়ে যাবে! আমার টেণ্ডারের রেট বেশি, আমার জিনিসও অন্যদের চেয়ে ভালো।

—না, তাও না। হাসপাতালগুলোতে আপনার সাড়ে নশো সেগুনকাঠের টেবিল সাপ্লাই করার কথা ছিল, কিন্তু দেখা গেল সেগুলো সবই সেগুনকাঠের বদলে প্লাইউডের—

—তোর এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারটা কি রে? এ-সব ব্যাবসার হের-ফের। যারা ব্যাবসা করে তারা জানে আজকাল সবাই তো এরকম করছে।

—সবাই না, তবে অনেকেই যে এইরকম চুরি-জোচ্চুরি করছে তা তো জানিই। সেসব অসৎদেরও সহ্য করে যাচ্ছি। কিন্তু তাদের আবার প্রণাম করাটাও একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না!

—তোদের বাড়িতে আমার আসাই ভুল হয়েছে! পাজী, ছুঁচো, বদমাস, বেল্লিক, বিটলে—

অন্যবার পুজোর পর প্রণাম করতে করতে কোমর বেঁকে যায়। এবার বেশ সুস্থ আছি। মাত্র দুটি প্রণাম করেছি। মাকে এবং পুরোনো ইস্কুলের সংস্কৃত মাস্টার-মশাইকে। খুঁজলে কি ওদেরও কোনো দোষ পাওয়া যাবে না ? যাবে হয়তো! কিন্তু জননী এবং শিক্ষকের সব দোষ সহ্য ও ক্ষমা করা যায়।

১৪

মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর লাগে, আমার চোখে, যখন তারা প্রবল বাতাসের স্রোতের বিপরীত দিকে হাঁটে।

হু-হু করছে হাওয়া, চুল এলোমেলো এবং আঁচলটা পিছনের দিকে ডানার মতন উড়তে থাকে, মেয়েরা তখন বদলে যায়, তাদের চোখমুখ অচেনা মনে হয়।

সেই রকম হু-হু করা বাতাসের মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এক পলক তাকিয়ে বরুণাকেও আমার হঠাৎ সুন্দরী মনে হলো। অন্য কোনো সময় মনে হয়নি, একটু পুরুষালি ধরনের চেহারা বরুণার, বেশ লম্বা, গায়ের রং ফর্সার কাছাকাছি হলেও রাজপুতানিদের মতন চওড়া হাতের কব্জী এবং নাকটা গুজিয়ার মতন ছোট আর বোঁচা। অন্য সময় সুন্দরী মনে হয় না, কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে বরুণাকে মনে হলো বত্তিচেল্লিক আঁকা 'থি গ্রেসেস'-এর অন্যতমা। আমি বরুণার দিকে আড়চোখে আবার তাকালুম। কিছু একটা কথা বলা দরকার, তাই বললাম, দারুণ হাওয়া দিচ্ছে, না ?

বরুণা যেন অন্য জগৎ থেকে কথা বলছে, সেইভাবে উত্তর দিল, আঃ, আমার ইচ্ছে করে, সমুদ্রের ওপর একটা ছোট্ট ডিঙি নিয়ে একলা এরকম হাওয়াব মধ্যে দিয়ে ভেসে যাই।

কথা হচ্ছিল নদীর পাড়ে! পাশেই বিশাল নিষ্প্রাণ দামোদর। ইউনেস্কোর উদ্যোগে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল—গ্রামের অশিক্ষিত চাষী-মজুররা কথা বলার সময় কতগুলো শব্দ ব্যবহার করে, সাধু বাংলা তারা কতখানি বোঝে—এই সব তথ্য সংগ্রহ করার। কলেজের কোনো একটা পরীক্ষার পরের ছুটিতে আমি বাইচান্স সেই চাকরি পেয়ে যাই!

ন'জন ছেলে এবং পাঁচজন মেয়ের একটি দল মিলে আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরতুম, ইস্কুল বাড়িতে ক্যাম্প করা হতো। সেই দলের একটি মেয়ে বরুণা, তখন আমরা বর্ধমানের কলানবগ্রাম, শক্তিগড় অঞ্চলে।

দলের চারটি মেয়ে আর চারশো মেয়েরই মতন, তারা ছেলেদের থেকে একটু দূরে আলাদা দল মিলে থাকে, লাজুক লতার মতন আড়ে আড়ে চায়, হাসির কথায় চুপ করে থাকে, আবার অকারণে হাসে, অকারণে ভয় পায়, পদে পদে "ইস্ কি বিশ্রী কাদা, উঃ কি বিচ্ছিরি গন্ধ..."। দলের মধ্যে যে-মেয়েটি সবচেয়ে সুন্দরী ছিল—তাকে আমরা ছেলেরা আড়ালে বলতুম, মিস পুটুলি, শাড়ি-ব্লাউজে জড়ানো একটা পুটুলির মতনই দেখতে ছিল তাকে। আমাদের বিকাশ মাঝে মাঝে মন্তব্য করত, ইস, অতই যখন লজ্জা, তখন চাকরি করতে আসা কেন?

একমাত্র বরুণা ছিল আলাদা। ডাকাবুকো ধরনের, অহেতুক লজ্জার বালাই নেই, ছেলেদের সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটছে, ছোটখাটো খানাখন্দ দেখলে দিব্যি লাফিয়ে পার হচ্ছে, কখনো বা কাদার মধ্যে হাঁটু ডুবিয়ে সাঁওতালনির মতন হি-হি করে হাসছে। বরুণা বলত—আমি চাকরিটা নিয়েছি কেন জানেন? এই যে বাড়ির লোকজন ছাড়াই একা-একা বেড়াবার সুযোগ পেলুম! বেড়াতে আমার এত ভালো লাগে!

সেই সময় আমার একটা গুরুতর অসুখ ছিল। ঘন ঘন প্রেমে পড়া। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে কোনো গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, তার জানলায় বসে-থাকা কোনো মেয়ের মুখ দেখেও এমন প্রেমে পড়ে যেতুম যে, মনে হতো, একে না পেলে আমি বাঁচব না। সাতদিনে আহারে রুচি থাকত না।

সুতরাং বরুণার সঙ্গেও যে আমি প্রেম করবার চেষ্টা করব, তাতে আর আশ্চর্য কি! বাকি ছেলেরা অন্য চারটি মেয়ের পিছনেই ঘুরঘুর করত, তাদের মুখের একটু হাসি চোখের ঝিলিক দেখবার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকত। বরুণাকে ওরা একটু ভয়-ভয় করত, তাছাড়া বরুণা বেশ লম্বা, অন্য ছেলেদের প্রায় সমান সমান—দলের মধ্যে আমিই একটু বেশি লম্বা ছিলুম বলে—আমার পাশেই বরুণাকে একটু-একটু মানাত।

কিন্তু হায় হায়, বরুণার সঙ্গে আমার এক বিন্দুও প্রেম হলো না।

বলাই বাহুল্য, আমাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় দলপতি ছিলেন—আমরা যে কাজের জন্য এসেছি সেটা সার্থক হচ্ছে কিনা দেখার বদলে—ছেলেরা মেয়েরা সব সময় আলাদা থাকছে কিনা, এটা লক্ষ রাখাই ছিল যেন তাঁর প্রধান দায়িত্ব। আমরা তাঁকে গ্রাহ্য করতুম না, এবং সব থেকে অগ্রাহ্য করত বরুণা।

বরুণা অনবরত আমাদের মধ্যে চলে আসত, খপ করে যখন-তখন হাত ধরত, ইয়ার্কি করে পিঠে কিল, পুকুর পাড়ে পা ধুতে গেলে গায়ে জল ছিটিয়েছে—এমনকি সন্ধের পরও এসে বলেছে, চলুন না এ গ্রামের শ্মশানটা দেখে আসি। কিন্তু গলার স্বর একটু গাঢ় করে কথা বলতে গেলেই বরুণা চোখ পাকিয়ে বলেছে,

এই, ওকি হচ্ছে, ন্যাকামি? ইস, একেবারে গদগদ দেখছি!

না, ওরকম মেয়ের সঙ্গে প্রেমের কথা বলা যায় না, ওদের সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব।

বরুণার বাড়ির কথা একটু একটু শুনেছিলাম। যৌথ পরিবার, জ্যাঠামশাই বিষয় আচারনিষ্ঠ, গোঁড়া। বাবা অধিকাংশ প্রৌঢ় মধ্যবিত্ত যে-রকম হয়, কোনো বিষয়েই কোনো জোরালো মতামত নেই, মা বহুকাল হাঁপানিতে শয্যাশায়ী, দাদা কাঠের ব্যাবসা ফেঁদেছে—আরো অনেকগুলো ভাইবোন। অর্থাৎ বরুণাদের বাড়িতে গিয়ে বরুণাকে দেখলে কোনো বৈশিষ্ঠ্যই দেখতে পেতুম না নিশ্চিত, সব মেয়ের মতনই গুটি গুটি কলেজ যায়—বাড়ি আসে, মাসি-পিসির সঙ্গে নাইট শো-তে সিনেমা যায়, দাদার বন্ধুরা বাড়িতে এলে সে ঘরে ঢোকা বারণ।

কিন্তু বাড়ির সঙ্গে খুব বোঝাবুঝির পর চাকরি নিয়েছে, আমাদের দলপতি নীতিশদা ওর কাকার বন্ধু— তিনি ওর ওপর নজর রাখবেন এই শর্তে। বাড়ি থেকে সেই প্রথম আলাদা বেরিয়েছে বরুণা, তার চরিত্র আমূল বদলে গেছে, পায়ে পায়ে ওর চঞ্চলতা, বরুণার মধ্যে একটা প্রবল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা দেখেছিলুম।

বরুণা বলত, পৃথিবীতে কত জায়গা আছে, আমার ইচ্ছে করে একা-একা ঘুরে বেড়াই! কোনো অচেনা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি, আঃ, ভাবতে যা ভালো লাগে!

আমি বলতুম, ইস, মেয়ে হয়ে শখ কত!

বরুণার চোখ ঝলসে উঠত। তীব্র স্বরে বলত, কেন, মেয়েরা বুঝি পারে না? ছেলেরাই সব পারে? দেখলুম তো কত ছেলে, মেয়েরও অধম! দেখবেন, আমি একদিন আফ্রিকা চলে যাব, একটি নতুন নদী কিংবা জলপ্রপাত আবিষ্কার করব!

আমি হা-হা করে হাসতুম। বলতুম, দেখা যাবে! বড়োজোর স্বামীর সঙ্গে হুড্রু জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া কিংবা বাবা-মার সঙ্গে এলাহাবাদের ত্রিবেণী—এর বেশি না।

বরুণা তখন রাগের চোটে দুম করে আমার পিঠে এক বিরাশী সিক্কা কিল!

আল্পস পাহাড়ের উচ্চতা, মিসিসিপি নদীর দৈর্ঘ ওর মুখস্থ ছিল। হিট্টাইট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ব্যাপারে একজন সুইডিস মহিলার অভিযানের কথা ও আমাকে শুনিয়ে ছিল। বরুণাও ছেলেমানুষের মতন কল্পনা করত, ও নিজেও একদিন মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা হিমালয়ের জঙ্গলে কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলবে।

সেবার আমাদের দলে বরুণা সত্যিই একটা অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী হয়েছিল। মরা দামোদরের পাড়ে আমরা দুপুরে এসে থেমেছি। বিষম হাওয়া দিচ্ছে, মেঘলা আকাশ। প্রত্যেকের দশজন চাষীকে ইন্টারভিউ করার কথা, আসবার পথে একটা

বাজার দেখে তা আমরা সেরে ফেলেছি। শেষ শীতের শুকনো দামোদর—বিরাট চওড়া—কিন্তু বেশির ভাগই বালি দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে জল। আমরা ঠিক করলুম, হেঁটে দামোদর পার হবো। বিদ্যাসাগর মশাই নাকি বর্ষার দামোদর সাঁতরে পার হয়েছিলেন, আমরা শীতের দামোদর হেঁটে রেকর্ড করব। তখন 'আওয়ারা' বইটা সদ্য রিলিজ করেছে, আমি আর বিকাশ রাজকাপুরের ভঙ্গিতে হাঁটুপর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নিলুম। হঠাৎ বরুণা বলল, আমিও যাব!

দলপতি নীতিশদা আঁতকে উঠে বললেন, না, কক্ষনো না, বরুণা যাবে না।

বরুণা ততক্ষণে আঁচল কোমরে বেঁধেছে, বলল, যাবই!

নীতিশদা বললেন, না বলেছি ? অনেক জায়গায় কোমর এমন কি বুক জল!

বরুণা বলল, তা হোক, আমি সাঁতার জানি। ঐ তো চাষীর মেয়েরাও পার হচ্ছে!

নীতিশদা বললেন, ওরা ঠিক ঠিক জায়গা চেনে। এক এক জায়গায় দারুণ স্রোত আছে। বরুণা, যেও না বলছি, তাহলে তোমার বাবাকে আমি নালিশ করতে বাধ্য হবো!

বরুণা এবার ঠোঁট উল্টে বলল, করুন গে যান, আমার বয়ে গেল! ততক্ষণে সে ঢালু পাড় দিয়ে নামতে শুরু করেছে!

প্রথমে বালি, বালির ওপর দিয়ে আমরা তিনজনে ছুটতে লাগলুম। বরুণার শাড়ি হাওয়ায় উড়ছে, ওর মুখখানা উদ্ভাসিত সুশ্রী। আমারও এমন ভালো লাগছিল যে, আমি ল্যাং মেরে বিকাশকে বালির ওপর ফেলে দিয়ে দুজনে গড়াগড়ি করলুম, বরুণা মুঠোমুঠো বালি আমাদের গায় ছুঁড়ে মারতে লাগল।

পাড়ে দাঁড়িয়ে বাকি সবাই দেখছে—ওরা ভদ্র, সভ্য—ওরা মাটিতে গড়াগড়ি দেবার কথা চিন্তাই করতে পারে না। একটু পরেই জলের ধারার কাছে পৌঁছোলুম। ঠাণ্ডা টলটলে জল—অঞ্জলি ভরে মুখে ছিটোলাম তিনজনেই, তারপর নেমে পড়লাম। বরুণা শাড়িটা হাতে ধরে উঁচু করে নিল। ক্রমশ ক্রমশ জল হাঁটু ছাড়াল —তখন বরুণা শাড়িটা ছেড়ে দিয়ে বলল, ভিজুক গে।

সেই জল ছাড়িয়ে আবার বালি—ওপর থেকে বোঝা যায় না, কত চওড়া নদীর খাত। আবার বালি ছাড়িয়ে জল। এবার জল উরু ছাড়িয়ে গেল—জল ঠেলার সাঁ সাঁ শব্দ... বরুণা আনন্দে একেবারে খলখল করছে, একবার হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়ে আমার হাত চেপে ধরল। আমি ওর কাঁধ ধরে বললুম, এবার দিই ডুবিয়ে ?

ও বলল, ইস, আসুন না দেখি, আমার গায় কম জোর নেই।

কোমর ছাড়িয়ে প্রায় বুক পর্যন্ত জল। বিকাশ বলল, জল আরো বাড়বে

নাকি ? বরুণা সে কথা গ্রাহ্য না করে উত্তর দিল, এত ভালো লাগছে, আমরা যেন-ওপারে কি আছে জানি না, যেন একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি! হাওয়া খুব জোর, জলেও স্রোতের টান লাগল, আর ব্যালান্স রাখা যাচ্ছে না, বিকাশ ভয়ে ভয়ে বলল, হঠাৎ জোয়ার টোয়ার এল নাকি! আমি কিন্তু সাঁতার জানি না! বলতে বলতেই বিকাশ হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আমাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল।

আমি বললুম, আরে, ওকি করছিস! বরুণা বলল, সাঁতার জানেন না তো এলেন কেন! বিকাশ বলল, চলো,আমরা ফিরে যাই।

বরুণা বলল, মোটেই না।

আমার দিকে ফিরে বলল, আপনি তো সাঁতার জানেন, আসুন আপনি আমি দুজনে যাই! বিকাশ বলল, নিলু, আমাকে আগে এ পাড়ে পৌঁছে দিয়ে যা। আমি পা রাখতে পারছি না! দুচোখ-ভরা বিদ্রূপ নিয়ে বিকাশের দিকে তাকাল বরুণা। তারপর সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে বরুণা বলল, আমি তাহলে একটু চললুম।

চাকরিটা ছিল মাত্র তিন সপ্তাহের। শেষ হয়ে যেতে তারপর আর কেউ কারুর খোঁজ রাখিনি। শুধু বিকাশের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। কিছুদিন আগে বিকাশ বলছিল, তোর সেই দেবী চৌধুরানী মার্কা মেয়েটাকে মনে আছে ? বরুণা ? সেদিন আমাদের এক কলিগের বাড়িতে গিয়ে দেখলুম, তার বউ সেই বরুণা। কি চেহারাই হয়েছে চেনা যায় না—এর মধ্যেই তিনটি বাচ্চা!

তার কিছুদিন পর আমিও একদিন বরুণাকে দেখেছিলুম দুপুরবেলা চলন্ত ট্যাক্সিতে। টাক মাথায় থালু-আলু মার্কা একজন লোক, নিশ্চয়ই বরুণার স্বামী, মুটিয়েছে বলে বরুণার মুখখানাও ভোতা ধরনের, সঙ্গে একটা দেড় বছরের ছেলে। খুব সম্ভবত সিনেমায় দুর্গম পাহাড় কিংবা নির্জন হ্রদের দৃশ্য দেখতে যাচ্ছে। না চেনার কি আছে ? এইটাই তো স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা।

বরুণার কথা আজ আবার মনে পড়ল, কেননা, কাগজে দেখছিলাম আটটি বাঙালি মেয়ে হিমালয়ে উঠে রন্টি শৃঙ্গ জয় করেছে। ভাবছি, এই খবরটা পড়ে বরুণা খুশি হবে, না দুঃখিত হবে ?

১৫

বারট্রাণ্ড রাসেল আমাকে বললেন, চলো হে ছোকরা, আগে বড়োবাজারটা ঘুরে আসা যাক।

আমি বললুম, স্যার বারট্রাণ্ড, ওখানে যেতে হলে আপনাকে তো চিৎপুরের ট্রামে যেতে হবে, তাতে আপনার কষ্ট হবে যে!

বৃদ্ধ দার্শনিক মৃদু হেসে বললেন, কেন বৎস, চিৎপুরের ট্রামের বিশেষত্ব কি?

আমি বললুম, ট্রাম জিনিসটাই বোধহয় আপনি বহুদিন দেখেননি। আপনাদের বিলেতে তো এসব পাট উঠে গেছে শুনেছি। এখানে—

—বাজে বোকো না। আমেরিকায় থাকতে শিকাগোতে ট্রাম দেখেছি, সানফ্রান্সিসকোতেও ট্রাম আছে। আর—

—আমেরিকাতেও ট্রাম আছে নাকি? জানতুম না তো?

—তুমি আর কতটুকু জানো? এবারে চিৎপুরের ট্রামের বৃত্তান্ত কি বলো!

আর্ল রাসেল, ট্রাম সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? বা যে-কোনো গাড়ি সম্পর্কে? গাড়ি হয় সামনে দৌড়োয় অথবা থেমে থাকে। কখনো পিছনেও আসতে পারে, কিংবা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে ঝাঁকুনি লাগে। কিন্তু, গাড়ি চলতে চলতে ডাইনে বায়ে কোমর দোলায় এ রকম হয় কখনো শুনেছেন? কী এক অলৌকিক কারণে, চিৎপুরের ট্রামে এই রকম হয়। সুতরাং ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুইস্ট নাচতে আপনার এই বয়সে বোধহয় অসুবিধে হবে! তা আপনাকে বৃদ্ধ দেখে যদি কেউ সম্মান করে সীট ছেড়েও দেয়, তবুও চিৎপুরের ট্রামেই, এখনো সব কাঠের বেঞ্চি। কোনো গদি নেই। আপনার লাগবে—

জ্ঞানবৃদ্ধ মুচকি হেসে বললেন, সে ব্যবস্থা আমার করা আছে। আমার প্যাণ্টের পিছনে গদি সেলাই করা। শান্তি আন্দোলনের সময় লণ্ডনের রাস্তায় যখন 'সীট-ইন' করেছিলাম, তখনি বসার সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করেছি। তা যাকগে, ট্রামে আমাদের যাবার দরকারটাই বা কি বাপু? চিৎপুরের রাস্তায় বাস চলে না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ চলে। খুব ভিড় হয় যদিও, তবু চলুন, বাসেই যাই।

চার নম্বর বাসে বিপুল ভিড়। এ রাস্তায় বাসে কম লোক উঠলেও বেশি ভিড় হয়, কারণ অধিকাংশ লোকেরই কোমরের বেড় সাধারণ মানুষের তিন গুণ। আমরা পেছনের দরজা দিয়ে উঠে এক কোণে গুটিশুটি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বুড়োমানুষের একটু বেশি কথা বলার স্বভাব থাকে। বারট্রাণ্ড রাসেল আমাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। যেমন, এ বাসে একটিও মেয়ে দেখছি না কেন হে?

আমি বললুম, এই ৯৪ বছর বয়সেও আপনার মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ আছে দেখছি!

—কার না থাকে? মরার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ মানুষের ঘোচে না।

—হুঁ। মেয়ে-ঘটিত ব্যাপারেই আপনাকে আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল না?

—ওসব পুরোনো কথায় তোমার দরকার কি হে, ছোকরা? যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দাও!

—আছে, মেয়েরা আছে। বাসের সামনের দিকের কয়েকটা আসন শুধু মেয়েদের জন্য। ভিড়ের মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।

—ঐ জন্যই সামনের দরজায় এত ভিড়! তা তো হবেই। পুরুষেরা মেয়েদের কাছাকাছি দাঁড়াবার চেষ্টা যদি না করে, তবে সেটাই তো অস্বাভাবিক।

—দেখছেন না, বাসের পিছন দিকে সহজে কেউ আসতে চায় না।

—তা তো হবেই, সামনের দিকে ওরাই সুস্থ লোক। তা তোমাদের বাস কোম্পানি মেয়েদের সীট শুধু সামনের দিকে না রেখে সারা বাসে ছড়িয়ে দেয় না কেন? তাহলে ভিড়টাও ছড়িয়ে যায়। আমরা দু'একজনের দেখা পেতুম!

—সারা বাসে ছড়িয়ে দিলে মেয়েদের উঠতে নামতে অসুবিধে হতে পারে।

—কচু হতে পরে! মেয়েদের কিছুতেই কিছু অসুবিধে হয় না। পুরুষদের চেয়ে তারা যে-কোনো অবস্থার সঙ্গে বেশি মানিয়ে নিতে পারে। তুমি আমাকে সামনের দরজায় না তুলে এখানে তুললে কেন?

—আজ্ঞে, ওখানে অত ভিড়! আচ্ছা ফেরার সময় না হয়...

—সামনের দরজার কণ্ডাকটার মাঝে মাঝে তারস্বরে কী বলে চেঁচাচ্ছে?

—ও ভিড়কে উদ্দেশ্য করে বলছে, লেডিজ সীটের সামনে ভিড় করবেন না, পিছন দিকে এগিয়ে যান!

—বেশ করবে লেডিজ সীটের সামনে ভিড় করবে! মানুষের ইনসটিংক্টও বদলাতে চায়? আর কি বলছে, বললে?

—পিছন দিকে এগিয়ে যান—

—পেছন দিকে এগিয়ে যান? ওঃ হো-হো—

দার্শনিক তাঁর বাঁধানো দাঁতে ফটফটে সাদা হাসি হেসে উঠলেন, পিছন দিকে এগিয়ে যান? হাঃ-হাঃ-হাঃ, ওঃ, এমন মজার কথা বহুদিন শুনিনি।

—আর্ল সাহেব, এতে মজার কি পেলেন?

—তোমার মাথায় দেখছি পঞ্চগব্যের একটি মাত্র গব্যই ভরা! মজাটা বুঝতে পারলে না? পৃথিবীর সব মনীষীরা বলে গেছেন, সামনে চলো! তোমাদের ভারতীয় ঋষিরাও বলেছেন চরৈবেতি। আর এখানে শুনছি, পিছন দিকে এগিয়ে যান! ওঃ-হো-হো। এই বুঝি তোমাদের সাম্প্রতিক নীতি, পিছন দিকে এগোনো?

আমি ওঁর কাঁধে টোকা দিয়ে বললাম, চুপ চুপ, আস্তে। এসব কথা বলে

বিপদে ফেলবেন দেখছি। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। কলকাতা শহরে আপনার আত্মপরিচয় গোপন রাখাই ভালো। এখানকার লোক আপনার উপর খুব খুশি নয়।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর মুখে সরল চোখে বললেন, কেন আমি কি দোষ করেছি ?

—চীন যখন আমাদের আক্রমণ করেছিল ? আজকাল মাঝে মাঝে বড়ো বেমক্কা কথা বলেন! কিউবা নিয়ে যখন হাঙ্গামা হয়, আপনি সেবারও কেনেডিকে দুম করে যুদ্ধবাজ বলে বসলেন। আপনার ধারণা ছিল, কেনেডি ছুতো করে কিউবা ধ্বংস করতে চাইছে। পরে দেখলেন তো রাশিয়া সুড়সুড় করে মিজাইলগুলো নিয়ে গেল তুলে!

—শান্তি! শান্তি! ওসব কথা থাক।

—বার্ধক্য সত্যি দ্বিতীয় শৈশব। আচ্ছা যাক, আমরা এসে গেছি।

বাস থেকে নেমে আমরা হ্যারিসন রোড ধরে বড়োবাজারের দিকে এগিয়ে চললুম। এখন আর বৃদ্ধ দার্শনিকদের মুখে কথাটি নেই—আস্তে ঠুকঠুক করে হাঁটছেন এবং অবাক বিস্ময়ে দেখছেন চারদিক! মুখে যুগপৎ প্রজ্ঞার জ্যোতি এবং শিশুর সারল্য। ধপধপে সাদা মাথার চুল, ভুরু দুটিও সাদা—তিনি বড়োবাজারের নোংরা রাস্তা দিয়ে দিয়ে শ্লথ ভঙ্গিতে ঘুরতে লাগলেন আমার সঙ্গে। আমি ঈষৎ নিচু স্বরে, খানিকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে ওঁকে বললুম, প্রভু, এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী...বড়োবাজার! এক নিবিড় সুষমায় যশের সৌরভে ভুবন আমোদিত। এই যানবাহনসঙ্কুল, গলিঘুঁজিময় পল্লী, বাংলা দেশের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। এবং যে-হেতু এই সমগ্র পল্লীটিই হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ, সুতরাং এখানকার অধিবাসীদের প্রত্যেকের আর আলাদা কোনো হৃৎপিণ্ড নেই। এই যে সারি-সারি দোকানপাট দৈর্ঘ্যে ছোট প্রস্থে বড়ো একশ্রেণীর মানুষ বসে আছ—এদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যে যেখানে হৃদয় থাকার কথা ছিল, সেখানে হৃদয়ের বদলে আছে একটি ক্যাশ বাক্স, প্রতিনিয়ত টাকার ঝনঝন শব্দ হয়, সেই শব্দে বাংলাদেশ কাঁপে।

দার্শনিক ধীর স্বরে বললেন, তোমার কথার মধ্যে যেন ঈষৎ বিদ্রূপের সুর আছে। কিন্তু বণিকসমাজকে বিদ্রূপ করো না। বণিকদের তুচ্ছ করার অর্থ ইতিহাসের জ্ঞানের অভাব। গোষ্ঠীবদ্ধ হবার প্রথম স্তরে দলপতি কিংবা রাজা ছিলেন মাননীয়। এখন সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে বণিকই সমাজের প্রাণ। মানুষের জ্ঞান বা কল্পনাকে বিস্তৃত করেছে কে ? সাহিত্যিক বা শিল্পী নয়, বণিকরাই। নিজের দেশ বা গণ্ডির বাইরে যে মানুষ তাকাতে শিখেছে—তাও এই বণিকদেরই জন্য। তারাই পৃথিবীর মানচিত্র নির্দিষ্ট করেছে। আজ মানুষ এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে অনায়াসে বসতি

করতে পারে! আজ আর তুমি শুধু নিজের সমস্যায় বিব্রত নও, আলাস্কায় ভূমিকম্প হলে তুমি ব্যথা পাও, ভিয়েৎনামে বোমা পড়লে তোমার ভয় হয়, চন্দ্র অভিমুখে মহাশূন্যযান ছুটে গেলে তুমি উল্লাস বোধ করো—এরও মূলে আছে বণিকরাই।

আমি বললুম, তা মানি। কিন্তু আমাকে অন্য একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। এই যে বণিকদের দেখছেন, আলুপোস্ত, মশলাপট্টি, কাপড়ের বাজার, বাসনপাড়া—এসব জায়গা ঘুরে আমরা দেখলুম, ছোট ঘর প্রায়ান্ধকার, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দম আটকানো ভিড়—এর মধ্যে যে সমস্ত বণিকরা বসে আছে—তাদের এই দিনরাত পরিশ্রম কিসের জন্য? এদের পোশাক-পরিচ্ছদ বহুমূল্য নয়, এরা অনেকেই নিরামিষাশী—সুতরাং এদের ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য কতই বা অর্থ লাগে? তবু এরা প্রাণপাত করছে কেন? লক্ষ টাকার পর আবার কোটি টাকা অর্জনের জন্য এরা রক্তক্ষয় করছে?

—দেশের ও দশের উপকারের জন্য!

—দেশের উপকার? আপনি বলছেন কী? আপনি জাতে ব্রিটিশ বলেই কি সব বণিককে সমর্থন করবেন? কথায় কথায় এদের অনেকেই উধাও করছে বেবি ফুড—তা কি শিশুদের উপকারের জন্য? চাল-ডাল-তেল-নুন—যা যখন পারছে লুকিয়ে ফেলছে চতুর্গুণ দামের লোভে—এর নাম দেশের উপকার? আপনি কী করে বলছেন, বুঝিয়ে দিন। শুধুমাত্র লাভের নেশায় এরা দিনের বেলায় অন্ধকার নামাচ্ছে—

—সে দোষ ওদের নয়। বণিককে যে দাতা হতে হবে, তার কোনো মানে নেই। শ্রম থেকে উৎপাদন, উৎপাদন থেকে বিনিময়, বিনিময় থেকে বাণিজ্য, বাণিজ্য থেকে সমৃদ্ধি। বণিক সব সময় চেষ্টা করবে—বাণিজ্য থেকে যতদূর সম্ভব বেশি লাভ করা, এবং সেই লাভের অঙ্কে হবে নতুন নতুন বাণিজ্যের প্রসার। রক্ত খাওয়া যেমন বাঘের মজ্জাগত স্বভাব, এই স্বভাবকে দমন করা ঠিক নয়—তাতে দেশের সুদূরপ্রসারী ক্ষতি। উৎপাদন কম হচ্ছে বলে যদি বণিক লাভের ইচ্ছেটা বদলে ফেলে পরোপকারী সেজে যায়, যদি সে স্থিরমূল্যে বিতরণ কিংবা দান করা শুরু করে, তবে বাণিজ্যের বিস্তার রুদ্ধ হয়ে যাবে, এর কুফল ভোগ করতে হবে আগামী বহু বছর। শ্রমে আলস্য, কিংবা উৎপাদন কমে যাওয়ার জন্য বণিক দায়ী নয়। বাণিজ্যের নীতি স্থির করবে দেশের সরকার। সরকার যদি উদাসীন হয়, কিংবা বণিকের পা-চাটা হয়, তবে সে দোষ তাদের নয়।

—কিন্তু প্রভু, এ দেশের মানুষ যে মরতে বসেছে।

বৃদ্ধ মনীষী আবার খুকখুক করে হাসতে লাগলেন। বললেন, বাসের ঐ

কণ্ডাক্টর কী যেন বলছিল ? পিছন দিকে এগিয়ে যান! পিছন দিকে এগিয়ে যান! ও-হো-হো-হো। এরকম নতুন হাসির কথা বহুদিন শুনিনি। এই পিছন দিকে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে নতুন দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। তারই প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি চতুর্দিকে। চলো, একজন বণিকের সঙ্গে একটু কথা বলি।

রাস্তায় কাদা থিকথিক করছে, রিকশা এবং ঠেলাগাড়ির ভিড় এড়িয়ে, একটা বিশালবপু ষাঁড়কে পাশ কাটিয়ে আমি বারট্রাণ্ড রাসেলকে একটি দোকানের সামনে নিয়ে এলাম। দোকানের মালিকটি প্রৌঢ়, মাথায় সোনালি রঙের পাগড়ি, কপালে এবং নাকে চন্দনের তিলক, হাসলে দু'টি সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত দেখা যায়! সেই শ্রেষ্ঠী নন্দনকে দার্শনিক বললেন, আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করব। তুমি একটি মাত্র কথায় তার উত্তর দাও। প্রশ্নটি হচ্ছে তুমি কি চাও ?

বিনা দ্বিধায়, মুহূর্তমাত্র না ভেবে সে বলল, যুদ্ধ!

রাসেল আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, লোকটা সৎলোক। সত্যিকারের মনের কথাটা বলেছে। এই আলস্য ও জড়তা ভাঙার একমাত্র উপায় যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় উৎপাদন বহুগুণ বাড়তে বাধ্য—তাতে বণিকদের সমৃদ্ধি, তাই বণিক চাইবে যুদ্ধ। আর যুদ্ধে মানুষ ও মনুষ্যত্বের বিনাশ বলে দার্শনিক চাইবে শান্তি। এই বণিক ও দার্শনিকের বিপরীত টানেই সভ্যতা টিকে থাকে। আমি এ কথা ভালোভাবেই জানতুম। কিন্তু মাঝখান থেকে এই আণবিক অস্ত্রগুলো এসেই যেসব গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। যুদ্ধ একবার বাধলে আর যে শেষ হবে না!

আমি বললুম, যুদ্ধ যুদ্ধ আপনার একটা বাতিক হয়ে গেছে! এখানে গোপন যুদ্ধ অনবরত চলেছে, তা বুঝি টের পেলেন না ? যাকগে, চলুন এবার ফেরার বাসে উঠতে হবে। আবার পেছন দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক!

১৬

ওঃ, কতকাল যে মানুষের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কথা শুনিনি। অস্পষ্টভাবে যেন মনে পড়ে, ছেলেবেলায় প্রায়ই শুনতুম, পাশের বাড়ি থেকে বা চেনাশুনো আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

একটি লাল পাড়ের শাড়িপরা প্রৌঢ়া মহিলা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন, কী রকম যেন ঠাণ্ডা তাঁর চেহারা, কখনো তাঁকে চেঁচিয়ে হাসতে শুনিনি। —শুনেছিলাম, তাঁর স্বামী এগারো বছর আগে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন। সন্ন্যাসী হওয়াটা অবশ্য দূর কল্পনা, কারণ তিনি তো আর বাড়ি থেকে গেরুয়া

কাপড় পরে বেরোননি, এমনি একদিন বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। হাসপাতালে বা থানায় তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি, সুতরাং সকলে ধরে নিয়েছিল—তিনি সাধু হয়ে সংসার ত্যাগ করেছেন। এগারো বছরে আর ফেরেননি, কেউ জানে না তিনি বেঁচে আছেন কিনা, কিন্তু সেই প্রৌঢ়া মহিলাটি, আমরা যাকে কমলামাসি বলতুম, তিনি লালপাড়ের শাড়ি পরে নিজের বৈধব্য অস্বীকার করতেন।

কখনো হয়তো তীর্থ থেকে ফিরে এসে কেউ খবর দিতেন, কমলার স্বামী যতীনবাবুকে দেখলুম হরিদ্বারে। আমাকে অবশ্য চিনতে পারল না, কিন্তু অবিকল যতীনের চেহারা। একমুখ দাড়ি, মাথায় জটা—তবু আমার চিনতে ভুল হয়নি।

হয়তো তার পরের মাসেই আবার অন্য কেউ বললেন, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে একজন সাধু দেখলুম, হুবহু যতীন রায়ের মতন, আমাকে দেখেই চট করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল!

কে জানে সত্যি ওরা যতীন রায়কে দেখেছিল কিনা, কিন্তু জর্দা ছাড়া যিনি পান খেতে পারতেন না, রোজ সকালবেলা পোষা পাখিকে ছোলা খেতে না দিয়ে যিনি নিজে চা পর্যন্ত মুখে দিতেন না (এসব আমার শোনা কথা, কখনো যতীন রায়কে আমি চোখেই দেখিনি)—সেই সংসারী এবং আসক্ত যতীন রায় একদিন বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়ে কিসের ডাক শুনতে পেয়ে কোথায় চলে গেলেন কে জানে।

কিন্তু রহস্যপূজারী শৈশবে আমি মনে মনে যতীন রায়কে খুব শ্রদ্ধা করতুম। কল্পনা করতে ভালো লাগত, কোথায় কোন বিজন বনে কিংবা পাহাড় চূড়ায় উদাসীন মুখে যতীন রায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ওসব জায়গায় আর জর্দা কোথায় পাবেন, তাই এগারো বছর তিনি আর পান খাননি, ঠোঁট দেখলেই বোঝা যায়। আর এই বিশ্ব-সংসারের যাবতীয় মুক্ত পাখিরা নিজেরাই নিজেদের খাদ্য খুটে খুটে খাচ্ছে—হয়তো সেই দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতেন।

আজকাল এই রকম সাধু হয়ে যাওয়া বা নিরুদ্দেশের খবর একেবারে কানে আসে না। তাহলে এখন সাধু হয় কারা? সাধুদের সংখ্যা অনেক কমে আসছে নিশ্চিত।

চোখ বুজলেই দেখতে পাই হিমালয়ের বহু গুহা এখন খালি পড়ে থাকছে। শহরে ফ্ল্যাটবাড়ির ভাড়াটে যত বাড়ছে, তত খালি হয়ে আসছে হিমালয়ের গুহা, ওসব জায়গায় হোটেল খোলা হবে হয়তো। রুদ্রাক্ষের মালা পরবার জন্য আর একটিও লোক থাকবে না। রুদ্রাক্ষের মালা তখন শুধু পরবে শৌখিন আমেরিকান মেয়েরা। গেরুয়া কাপড়ের একমাত্র দরকার হবে, যাত্রায় কিংবা ফিল্ম স্টুডিওতে।

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি, অথবা বন্ধুবান্ধবদের মুখে, কোথাও সন্ন্যাসী বা নিরুদ্দেশে যাবার বিন্দুমাত্র ইশারা নেই। সব জায়গাতেই লেখা, আরো দাও, আরো ভোগ করব, আমি চাই ব্যক্তিগত মালিকানা। রূপং দেহি, ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি, আয়ুং দেহি।

অনেক তদ্বির করে যে বেলগাছিয়ায় ফ্ল্যাট পেয়েছে, সে এখন চায় জমিদারি। যে বড়ো চাকরি পেয়েছে, সে যায় অন্যের চাকরি হরণ করতে, যে সুখী সংসার পেয়েছে, সে চায় অন্যের সংসার জ্বালিয়ে দিতে। নাঃ, চেনাশুনোদের মধ্যে কারুর তো আর নিরুদ্দেশে যাবার সম্ভাবনা দেখি না—যদি না, কারুর নামে পুলিশের হুলিয়া বেরোয়।

আমি নিজেও তো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোনো বৃষ্টিভেজা নির্জন সাদা বাড়ি দেখলে ভাবি, ঐ বাড়িব বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খেতে পারলে আমার জীবন সার্থক হতো। চৌরঙ্গির কোনো দোকানে শো-কেসে ঠাণ্ডা কাচে মুখ লাগিয়ে ভাবি অনেক সময়, ভিতরের ঐ রকম একটা সুন্দর জামা আমার কতকাল পরার সাধ ছিল! নীল রঙের কোনো মোটরগাড়ি দেখলেই আমার মনে হয়, ঐ রকম কোনো মোটরগাড়ি পেলে আমি একদিন সমুদ্রের পাড়ে যেতাম। আমারও নিরুদ্দেশে যাওয়া হবে না।

'বাবলু ফিরে এসো, মা শয্যাশায়ী কত টাকা লাগবে জানাও—' কাগজের এসব বিজ্ঞাপনও আজকাল অনেক কমে গেছে। আগে যেন মনে হয় প্রত্যেকদিন চোখে পড়ত। বাবলুরা আর আজকাল রাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় না, খোকন কিংবা মন্টুরাও আজকাল পরীক্ষায় ফেল করে নির্লজ্জের মতো বাড়িতে বসে থাকে। মঞ্জুলাদের বিয়ে করতে না পেরে রমেশরা আর এখন সাধু হয়ে যায় না, বরং মঞ্জুলাকে বিয়ে করে সংসারী হয়ে যায়।

সেই সব নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন পড়ে মনটা বড়ো উদাস হয়ে যেত। একসময় মনে হতো, যারা ঐ নিরুদ্দেশে চলে গেল তারা আর ফিরবে না কোনোদিন, ঐ সব বাবলু-মন্টু-তপনরা অভিমানী মুখ নিয়ে চিরকাল পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে।

আমি যখনই কোনো অপরিচিত জায়গায় কোনো অভিমানী বিষণ্ণ মুখ দেখেছি তখনই মনে হয়েছে—এও বোধ হয় সেই নিরুদ্দিষ্ট দলবলের একজন, যে তারা বাবাকে শয্যাশায়ী করে, মাকে কাঁদিয়ে অন্ধ করে, দাদাকে টাকা পাঠাবার জন্য ব্যাকুল অবস্থায় রেখে একদিন বাড়ি ছেড়েছিল, তারপর আর চক্ষুলজ্জায় কিংবা এক জীবনের অভিমানে ফিরতে পারেনি।

আমার ছেলে বাবলু অমুক তারিখে নিরুদ্দেশ হয়েছিল, তারপর সে এত তারিখে আবার সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছে—এবং আমি শয্যাত্যাগ করেছি—

এ-রকম কোনো বিজ্ঞাপন কখনো কাগজে বেরোয় না। আমরা শুধু নিরুদ্দেশেরই খবর জানি। ফিরে আসার খবর জানি না।

কিন্তু একজন ফিরে-আসা মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি একজন বিল্ডিং কনট্রাক্টর, অর্থাৎ অন্য লোকের বাড়ি তৈরি করে দেন। মধ্যবয়সী, মাথাজোড়া বিপুল টাক, কোনো হাসির কথা শোনার পর তিন মিনিট ধরে হাসেন। এক বন্ধুর বিয়েতে বহরমপুর গিয়েছিলুম, ঐ ভদ্রলোকটিই সেই বাড়ির বড়ো জামাই, তাঁরই হাতে আমাদের আপ্যায়নের ভার।

বাইরের ঘরে বসে জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে, তিনি অর্থাৎ পরিতোষবাবু ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চা-খাবার, অফুরন্ত সিগারেট দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখছিলেন। হুড়মুড় করে বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণের গল্প শুরু হলো।

এক বন্ধু আমেরিকার গল্প শুরু করে দিল, সুযোগ পেলেই সে বিলেত-আমেরিকার গল্প ফেঁদে বসে, আমরা তাকে জোর করে চাপা দিয়ে কেদার-বদরী ভ্রমণের কথা শুরু করলুম। গত মার্চ মাসে আমরা তিনজনে সেখানে গিয়েছিলাম, সুতরাং বারোয়ারি উপন্যাসের মতন যখন আমরা তিনজন রোমহর্ষকভাবে এক-একটা অধ্যায় বর্ণনা করছি, তখন পরিতোষবাবু হঠাৎ বললেন, কালী কমলী ধর্মশালার কথা আপনাদের মনে আছে? সেই যে কালো কম্বল গায়ে এক সাধু যে সব ধর্মশালা—

আমরা তিনকণ্ঠে বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ...আপনি গিয়েছিলেন নাকি?

পরিতোষবাবু লাজুকভাবে হেসে বললেন, সেই ছেলেবেলায় আঠারো-উনিশ বছর বয়েসে—যখন বাড়ি থেকে পালিয়েছিলুম, তখন আমি ওখানেই ছিলুম।

—ওখানে ছিলেন? কতদিন?

—টানা তিন বছর! শীতের সময় হরিদ্বারে নেমে আসতুম, বসন্তে আর গ্রীষ্মে উঠে যেতুম পাহাড়ে। আহা, ভালোই ছিলাম!

আপনি বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিলেন?—আমাদের প্রশ্নের মধ্যে অভদ্র রকমের অবিশ্বাস। এই রকম একটা গোলাকার হাসিখুশি লোক বাড়ি থেকে পালাতে যাবে কি দুঃখে।

পরিতোষবাবু লাজুক হাসি হেসে বললেন, সত্যিই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম একসময়। তখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি—ফার্স্ট ইয়ার—হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা—

পরিতোষবাবুর গল্পের মধ্যে খুব একটা বিশেষত্ব নেই। ধনী পরিবারের ছেলে, পড়াশুনোয় ভালো, তখনো ব্যর্থ হবার মতো কোনো প্রেমে পড়েননি, কিন্তু বাড়িতে সৎ মা ছিল—কোনো বিশেষ অসুবিধে ছিল না যদিও, তবুও এক সন্ধেবেলা মন

খারাপ করে উনি বাড়ি থেকে চলে যান।

তারপর যথারীতি 'খোকা ফিরে, এসো' বিজ্ঞাপন বেরোয়, কিছু পুরস্কারের ঘোষণা হয়েছিল, পরিতোষবাবু নিজে হরিদ্বারে বসে সে কাগজ দেখেছেন, তবু ফিরতে ইচ্ছে হয়নি, 'বাড়ি নয়, ও তো ইঁটের পাঁজা'—এই ধরনের এক মনোভাব নিয়ে তিনি জীবনে আর কখনো বাড়ি ফিরবেন না বা সংসার করবেন না—ঠিক করে পাহাড়ে উঠে গিয়েছিলেন। তারপর, মাথা মুড়িয়ে, হাতে কমণ্ডলু নিয়ে পুরো সাধু।

কিন্তু পরিতোষবাবু তাঁর ফিরে আসার কারণটা পুরো ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। শুধু বললেন, ধর্মে কিংবা ভগবানে তো খুব একটা বিশ্বাস ছিল না। নেহাৎ বাড়ি বা সংসার সম্পর্কে বীতস্পৃহা নিয়ে বেশিদিন পাহাড়ে থাকা যায় না, বুঝলেন। একটা বাঙালি তীর্থযাত্রী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো, কথায় কথায় ওরা আমার পরিচয় জানতে পারলেন, তারপর ওদের অনুরোধেই ফিরে এলাম।

একজন স্থানীয় যুবক সেখানে বসেছিল। সে সকৌতুকে বলল, আপনারা আপাতত সেই বাঙালি পরিবারেই অতিথি। পরিতোষদা সেই পরিবারেরই বড়ো মেয়েকে বিয়ে করেছেন। লীলাদির সঙ্গে তো আপনার হিমালয়েই আলাপ, না পরিতোষদা?

নেমন্তন্ন খেতে বসে একজন স্থূলাঙ্গী ভদ্রমহিলাকে দেখলুম, তিনিই পরিতোষবাবুর স্ত্রী। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না পরিতোষবাবুর এবং প্রেমে না পড়েই তিনি গৃহত্যাগী হয়েছিলেন—প্রেমে পড়ার পর সংসারী হয়েছে—এ পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক। কিন্তু বাড়ি সম্বন্ধে বীতস্পৃহা নিয়ে যিনি সংসার ছেড়েছিলেন, ফিরে এসে তিনি বিল্ডিং কনট্রাক্টর হয়ে বহু লোকের বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছেন এখন—এই ব্যাপারটিতে কেমন যেন দমে গেলুম, কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল, পরিতোষবাবুর সঙ্গে আর তেমন হেসে কথা বলতে ইচ্ছে হলো না। মানুষ এরকম বিচ্ছিরি ভাবেও বদলায়?

১৭

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্ডেনস-এর মধ্যে আমি বিকেলবেলা একটা সাপ দেখতে পেলাম। সত্যি ঘটনা। তখন পড়ন্ত বিকেল, আবছা লাল রঙের ছায়া পড়েছে বাগান জুড়ে, সর্য ডুবে গেলেও আকাশে লাল মেঘ, হয়তো ঝড় উঠবে। এই সময় প্রচুর নবীন নারী-পুরুষ বেড়াতে আসে এখানে, জলের পাশে বসে যুবক-

যুবতীরা নিজেদের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে।

শুনেছি, প্রেমিক-প্রেমিকাদের পক্ষে সন্ধেবেলা এই স্মৃতি-উদ্যান বেশ উপযুক্ত, কারণ এখানে চোঙা-প্যান্ট পরা, সিটি-মারা, অনার্য-ভাষী ছোকরার দল ঘোরাফেরা করলেও তেমন উৎপাত করতে সাহস পায় না। ফলে, ফুলবাগানের পাশে প্রচুর তরুণ-তরুণী।

অবশ্য, ঐ বাগানে আমার নিজের যাবার কোনো কারণই নেই। আমি সৌভাগ্যহীন, একলা, আমার উপস্থিতি সেখানে অবাঞ্ছিত ও আকস্মিক।

আসলে ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে আমি একা হেঁটে ফিরছিলুম ধর্মতলায়, পথ সংক্ষেপ করার জন্য রেসকোর্সের পাশ দিয়ে বেঁকে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনসের মধ্য দিয়ে শর্টকাটের চেষ্টা করছি। ঢুকে বেশ ভালো লাগছিল, কতদিন এসব জায়গায় আসিনি, এখানে গাছের পাতার মধ্য দিয়ে শিরশির শব্দ হয়, মাঝে মাঝে তরুণ-তরুণীর কণ্ঠে শোনা যায় ফিসফিসিয়ে অভিমান বা উল্লাসের সুর।

সন্ধেবেলা একা কোনো জিনিস ভালো লাগলেই মন খারাপ হয়ে যায়। আমারও যথারীতি মন খারাপ হয়েছিল, সুতরাং আমি আস্তে আস্তে হাটছিলুম। এমন সময় চিৎকার শুনতে পেলুম, সাপ, সাপ!

আবার বলছি, সত্য ঘটনা। সাপ শুনেই আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠেছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, না গাছে উঠব। কয়েক কোটি বছর ধরেই আমি সাপকে বিষম ভয় ও ঘৃণা করি।

গোটাকয়েক ছেলে, এদের সঙ্গে কোনো নারী নেই, কিন্তু হাতে ট্রানজিস্টার আছে, ওরাই প্রথমে সাপটিকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। ঘাসের মধ্যে নয়, ঘাস থেকে বেরিয়ে সুরকি-ঢালা রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছিল সাপটা, এই সময় ছোকরাদের চেঁচামেচিতে বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠে ও মাথা ঘুরিয়ে ফিরে তাকায়।

প্রায় হাত তিনেক লম্বা, ধূসর গায়ের রং, নিশ্চিত বিষাক্ত। কারণ, যে-সাপ সোজা ছুটে না পালিয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকায় সে বিষাক্ত না হয়ে যায় না।

আমি ততক্ষণে আমার জামার সব-কটা বোতাম খুলে ফেলেছি, মুহূর্তে জামা খুলে ফেলার জন্য তখন আমি তৈরি। কারণ, আমি শুনেছিলাম, সাপ দেখলে ছুটে পালানো যায় না, সাপ সামনাসামনি এসে পড়লে গায়ের জামা খুলে ওর ওপর ছুঁড়ে দেওয়াই নাকি বাঁচার একমাত্র উপায়।

ছেলেগুলো রৈ-রৈ করে উঠল, কেউ ছুটে পালাল না। আমি অবশ্য জানি ওরা প্রত্যেকেই আমারই মতন কাপুরুষ, কিন্তু দলবদ্ধ হলে কেউ কারুর কাপুরুষতা দেখাতে চায় না। ওরা তখন মার মার, লাঠি নিয়ে আয়, তুই ওদিকে দাঁড়া—এই সব চিৎকার শুরু করল।

কিন্তু কারুর কাছেই কোনো অস্ত্র নেই, লাঠি তো দূরে থাক, চেঁচামেচিই চলতে লাগল বেশ খানিকক্ষণ, এর মধ্যে একজন বুদ্ধি করে নিজের পায়ের ছুঁচলো জুতোর একপাটি ছুঁড়ে মারল। জুতোটা সাপটার গায়ে লাগল না, সামনে গিয়ে পড়তেই সাপটা থমকে দাঁড়িয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। চড়াৎ করে দু'বার বেরিয়ে এল চেরা জিভ, অল্প একটু ফণা মেলে ধরল, এ তো নিশ্চিত বিষাক্ত।

আমি তখন যদিও নিরাপদ দূরত্বে আছি, কিন্তু ভয়ে বুক হিম হয়ে এল।

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, এখানে ওখানে ঘাসের ওপর বসে আছে জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণী, কিন্তু কারুর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ভ্রাম্যমাণ যুগলেরাও কেউ কৌতূহলী হয়ে এখানে এল না, এদিকে তাকালই না, হয়তো ভেবেছিল এসব ইমার্কি। ছেলের দল সাপটাকে তাড়া করতে লাগল, সাপটা এবার একটু দ্রুতভাবে ছুটে মেয়েদের জন্য নতুন তৈরি-করা বাথরুমটার পাশে একগাদা জড়ো-করা বালির বস্তার ফাঁকে ঢুকে পড়ল।

ছেলের দল কোথা থেকে কয়েকটা ইটপাটকেল যোগাড় করে এখন সেই দিকে ছুঁড়ছে। কিন্তু এখন কোনোই ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। সাপটা নিশ্চিন্তে বালির বস্তার আড়ালে লুকিয়ে। লাঠি হাতে একজন উদ্যানরক্ষীকেও দেখা গেল কাছাকাছি, উত্তেজিতভাবে বোঝান হলো সাপটার অস্তিত্ব, সে ঠোঁট উল্টে বলল, না, সাপ নয়।

—নিজের চক্ষে দেখলুম, ই-বা বড়ো সাপ। সাপ নয় কি বলছ।

—কলকাতা শহরে আবার সাপ কোথায়?

—দেখো না ঐ বালির বস্তাটার কাছে গিয়ে!

লোকটি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে গেল। লাঠি দিয়ে একটা খোঁচা মারল বালির বস্তার মধ্যে। বেশ দূর থেকেও আমি স্পষ্ট ফোঁস শব্দ শুনতে পেলাম। লোকটির মুখে স্পষ্ট ভয়, তবু উদাসীন গলায় বলল, ঢোঁড়া, ঢোঁড়া, বিষ নেই ও কিছু নয়।

এরপরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল, কিন্তু দেখা গেল বালির বস্তা সরিয়ে সাপটিকে খোঁজার সাহস কারুরই নেই। একটু বাদে জটলা ভেঙে গেল। আমি তখনো দাঁড়িয়েছিলাম, এখন মুস্কিল হলো এই যে, আমাকে যেতে হলে এখন ঐ বালির বস্তাগুলোর পাশ দিয়েই যেতে হয়। কিন্তু সে কথা ভাবতেই আমার বুক গুরগুর করতে লাগল।

অবশ্য, ভিড় ভেঙে যাওয়ায় ইতিমধ্যে লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। অনেকে ঐ বালির বস্তাগুলোর পাশ দিয়েই নিরুদ্বেগে হেঁটে যাচ্ছে, কিন্তু ওরা তো জানে না, আমি যে সাপটার অস্তিত্ব জানি! আমি ওপাশ দিয়ে যেতে পারব

না। ইচ্ছে হলে, আমি অবশ্য উল্টোদিকে ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে এমন কাপুরুষতা আছে যে আমার নিজেরই লজ্জা করতে লাগল।

নিজের কোনো ব্যবহারে যখন নিজেরই লজ্জা হয়, তখন মনে হয় যেন আশেপাশের সব লোক আমার সেই বোকামি দেখে ফেলছে। আমার মনে হলো, আমি উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলে আশেপাশের সব লোক যেন হেসে উঠে বলবে, ইস, ভীতু কাঁহাকা! কিন্তু যাই হোক, স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে আমি সাপের পাশ দিয়ে কিছুতেই হাঁটব না।

সুতরাং আমি পাশের রেস্টুরেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। যেন আমি এখানে চা খেতেই এসেছিলাম। আবার উল্টোদিকে ফিরে যাব।

তখনো চা খাওয়া শেষ হয়নি, ভয়ার্ত, মেয়েলী গলায় রিনরিনি স্বর শুনতে পেলাম, ওমা, এ কি—সাপ! সাপ!

আমি রেস্টুরেন্টে বসে ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম—দুটি ছেলে-মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘাসের ওপর বসে আছে, খুবই তরুণ বয়স, এখনো কলেজের গন্ধ লেগে আছে গায়। তরুণীটি স্প্রিংয়ের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে উঠল, যুবকটিও উঠে দাঁড়াতেই তরুণী তার কণ্ঠলগ্না হয়ে বলল, ঐ দ্যাখো, কত বড়ো সাপ!

আগেকার ছেলেগুলোর চিৎকারে কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনি, এবার একটি মেয়ের চিৎকারেই যথেষ্ট কাজ হলো। বহু কৌতূহলী লোক সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, অনেকে এগিয়েও গেল। একজন আবার চেঁচিয়ে উঠল, পুলিশ পুলিশ। পুলিশ কোথায়!

দেখা গেল, যুবকটি বেশ সাহসী—অথবা, প্রেমিকার সামনে কে না সাহসী হয়! সে বেশ দৃঢ়স্বরে বললে, দেখতে পেয়েছি, দাঁড়াও, নড়ো না, ভয় নেই।

সাপটা ওদের থেকে পাঁচ-ছ গজ দূরে, যুবকটির হাতে দুখানা মোটা বই ছিল, সে একটা বই ছুঁড়ে মারল সাপটার দিকে। বইটা সাপটার গায়ে গিয়ে লাগতেই সে ফণা তুলে বইটার ওপর ছোবল মারল। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বইটা ছুড়ে মারল। সাপটা আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু যথেষ্ট আহত হয়নি, এবার বেশ ভয় পেয়ে সরসর করে ছুটে পালাল।

এরপর অবশ্য বহু খোঁজাখুঁজি করেও আর সাপটাকে পাওয়া গেল না। নীরক্ত, বিবর্ণ মেয়েটিকে আলিঙ্গনে রেখে যুবকটি বেরিয়ে এল সড়কির রাস্তায়। মেয়েটি অস্ফুট স্বরে বলল, উঃ, আমার কত কাছে এসে পড়েছিল। যদি না দেখতে পেতুম—

আমি ভাবলুম, সাপটা মেয়েটার কাছে গিয়েছিল কেন? সাপটা কি আসলে ছদ্মবেশী শয়তান? ভিক্টোরিয়ার বাগানে না হয়ে ব্যাপারটা যদি ইডেন গার্ডেনে

হতো, তা হলে তো বর্ণনা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।

এসব বাগানের মালিক কে? যদি ভগবান হয়, তবে আমার বলতে ইচ্ছে হলো, প্রভু, আর কেন ছলনা করছ? ঐ নিষ্পাপ সুকুমার যুবক-যুবতীর পিছনে আবার কেন শয়তানকে লেলিয়ে দিচ্ছ? একবার তো স্বর্গ থেকে পতন হয়ে গেছে, আবার তুমি ওদের কোথায় ঠেলে ফেলে দিতে চাও?

তখন দৈববাণী শ্রবণের মতো অনুভব হলো আমার, একবার যখন ওরা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেছে, তখন শয়তান আর কোনো প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষতি করতে পারবে না। দেখলি না, ছেলেটি কি রকম অবলীলাক্রমে সাপটার দিকে বই ছুঁড়ে মারল।

১৮

মেয়েদের ভালোবাসতে শেখার পরই আমি কুকুরকে ভালোবাসতে শিখি। হ্যাঁ, ভালোবাসা শেখারও তো নির্দিষ্ট স্তর আছে। এখন যে-কোনো যুবতী সুন্দরীকে দেখলে কিংবা তার সঙ্গে কথা বললে—এমনকি দূর থেকে গলার আওয়াজ শুনলেই বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে ওঠে, মনে হয়, এ জীবনটা মধুময়। কিন্তু বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় মেয়েদের একদম দেখতে পারতুম না।

প্রথম ইস্কুল জীবনে, সমবয়েসী মেয়েরা যখন গায়ে পড়ে মিশতে আসত, আমরা মোটেই তাদের পছন্দ করতুম না, বলতুম, তোমরা মেয়েরা আলাদা থাকো না গিয়ে। সেই যখন মেয়েরা গায়ে পড়ে মিশতে আসত—তখন তাদের গ্রাহ্যই করিনি—পরে, এখন বড়ো হয়ে ওঠার পর, মেয়েরাই আর আমাকে গ্রাহ্য করে না। কত আত্মাভিমানিনী, তেজি, উদাসীনা, মরীচিকার মতন মেয়েদের দিকে আমাদেরই গায়ে পড়ে ছুটোছুটি করতে হয়।

ছেলেবেলায় বন্ধুদের বাড়িতে ক্যারাম খেলতে যেতুম, কোনো বন্ধুর বোন যদি সঙ্গে খেলার জন্য বায়নাক্কা করত—তখন মাথায় গাঁট্টা মেরে ভাগিয়েছি, অথচ, পরবর্তী কালে, হায়, কত বন্ধুর বোনের জন্য যে কত বুক খালি-করা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছে!

মেয়েদের না, কুকুরের কথা বলছি এখন। ছেলেবেলায় আমি কুকুর একেবারে সহ্য করতে পারতুম না। আমার ছোটকাকার একটা বিশ্রী, জঘন্য কুকুর ছিল, সেটা ন্যাকার মতন সবসময় পায় লুটোপুটি করত, আমি দু'চক্ষে দেখতে পারতুম না তাকে। ছোটকাকার কাছে কোনোদিন আমি পয়সা চেয়ে পাইনি, অথচ কুকুরের

জন্য—সাবান, ডগ বিস্কুট, (আমি নিজেই সে বিস্কুট দু'-একখানা লুকিয়ে খেয়ে দেখেছি, খুব খারাপ খেতে নয়), রবারের বল, রঙিন বগলস কিনে দিতে তিনি উদারহস্ত।

এটাই কুকুরটার প্রতি আমার শত্রুতার ছিল প্রধান কারণ। কুকুরটাও আমার দিকে এমন চোখ মিটমিট করে তাকাত—যার মধ্যে আমি স্পষ্ট একটা আদুরে হিংসুকপনা দেখতে পেতুম। আবার লাল্লি, লুল্লু, লালটুসোনা এইরকম কত ন্যাকা নাম ছিল তার। কুকুরটা ছিল ছোট্টখাট্ট, সুযোগ পেলেই আমি সেটাকে আড়ালে লাথি কষাতুম।

আমার দাদার এক বন্ধুর বাড়িতেও আমি যেতে পারতুম না কুকুরের ভয়ে। অবনীদা আমাকে দেখলেই বলতেন, হেমেন রায়ের যখের ধন পড়েছিস? শিবরামের মন্টুর মাস্টার পড়েছিস? আমাদের বাড়িতে আসিস, অনেক বই আছে, নিয়ে যাস! অবনীদাদের বাড়ির দরজায় একটা সিংহের মতো আকৃতির কুকুর বাধা থাকত, মানুষ দেখলেই সেটা মেঘ-গর্জনের মতো গম্ভীর গলায় ঘাউ ঘাউ করে ডাকত। সেই ডাক শুনে সে বাড়ির ধারে-কাছে যাবারও সাহস ছিল না আমার।

কুকুরের মতন অমন একটা ভয়ঙ্কর জিনিসকে কেন মানুষ বাড়িতে খাতির করে রাখে আমি বুঝতেই পারিনি। একদিন ইস্কুল থেকে ফেরার পথে, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, একটা নেড়িকুত্তা আমার পায়ে এসে খাক করে কামড়ে দিল। খুব বেশি লাগেনি বটে, কিন্তু বাড়িতে এসে সে কথা বলতেই সবাই আৎকে উঠে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কী রকম কুকুর ছিল? ল্যাজ গোটানো কান ঝোলা? জিভ দিয়ে লালা পড়ছিল?

ওসব কিছুই আমি লক্ষ্য করিনি, সবাই বলল, আমার নাকি জলাতঙ্ক হতে পারে। ইনজেকশন দেওয়া হলো, তবু আমার জলাতঙ্কের আতঙ্ক কাটে না। তারপর প্রায় এক বছর গ্লাস, চৌবাচ্চা, নদী—যেখানেই জল দেখেছি আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছি, ভেবেছি, জল দেখে কি আমার আতঙ্ক হচ্ছে? বুঝতে পারিনি, অনেকক্ষণ জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেরই চোখে জল এসে গেছে।

তারপর তখন ক্লাস নাইনে পড়ি, আমাদের পাড়ায় নতুন ভাড়াটে এল। একটু অদ্ভুত ধরনের লোক, ওরা বর্মা-ফেরৎ বাঙালি। ও বাড়ির লোকেরা হলুদ-সবুজ-রঙা সিল্কের লুঙ্গি পরে। ও বাড়ির ছেলেরা বাবাকে বলে ড্যাডি। ও বাড়িতে প্রায় সব সময় গ্রামাফোনে বিলিতি বাজনা বাজে। ওরা দোলের দিনও রঙ খেলে না, ছাদে নেট খাটিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলে।

একদিন, আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, ওপর থেকে ব্যাডমিন্টনের কর্ক ঠক করে এসে আমার মাথায় পড়ল। তিনতলার ছাদের কার্নিস থেকে উঁকি মেরে একটি চতুর্দশী বালিকা সুরেলা গলায় আমার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল, বলটা একটু ওপরে পৌঁছে দেবেন, প্লীজ—।

সেই থেকে আরম্ভ। তখন নাক ও ঠোঁটের মাঝখানে একটা কালো রেখা দেখা দেওয়ায় নিজেকে ছেলের বদলে পুরুষ হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করেছি। ট্রামে বাসে কেউ 'তুমি' বললে চটে যাই। চেনাশুনো মেয়েদের দেখলে ভুরু তুলে গম্ভীর হয়ে থাকি, মনে মনে তাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব। মনে হয়, আহা বেচারারা শুধু ছেলেবেলা নিয়েই মেতে থাকে। কোনো মেয়ে তখন আমাকে কিছু অনুরোধ করার কথা কল্পনাই করতে পারে না।

সেই সময়, তিনতলার ছাদ থেকে একটা চোদ্দ বছরের মেয়ের সরাসরি হুকুম, বলটা ওপরে পৌঁছে দিন! কিন্তু তা শুনেই আমার মনে হলো, স্বর্গ থেকে কোনো দেবী আমাকে ডাকছেন। আমি কর্কটা হাতে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলাম। কী যেন ছিল মেয়েটির নাম, শোভনা কিংবা সুশোভনা, ঝকঝকে ফর্সা রং, ঘাগরার মতন কুঁচি দেয়া লাল টুকটুকে স্কার্ট পরা, গড়গড় করে ইংরাজিতে কথা বলছে, কর্কটা নেবার সময় আমার হাতে মেয়েটির ছোঁয়া লাগল, ঝনঝন করে উঠল আমার সারা শরীর। সেই দিন থেকেই আমার মেয়েদের প্রেমে পতন এবং মূর্ছার আরম্ভ।

আমরা ইস্কুলের তিনজন বন্ধু—প্রত্যেক দিন বিকেলে শোভনাদের বাড়িতে যেতাম। শোভনা আমাদেরই সমবয়েসী, অনায়াস স্বচ্ছন্দ ওর ব্যবহার। আমাদের রেকর্ড শোনাত, আমাদের সঙ্গে ওয়ার্ড-মেকিং খেলত, আমরা মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখতুম। আমরা তিনজনেই ওর প্রেমে পড়ে গেলুম। শোভনার মা আমাদের নানারকম খাবার খাওয়াতেন, সেইসঙ্গে রেফ্রিজারেটরের ঠাণ্ডা জল। তার আগে আমি কখনো অত ঠাণ্ডা জল খাইনি। একদিন তিনি নানারকম পায়েস আর পিঠে খাওয়ালেন, বললেন, তোমাদের বাড়িতে এসব হয়নি? আজ যে নবান্ন!—আমরা কলকাতায় থেকেই নবান্নের কথা ভুলে গিয়েছিলুম, ওঁরা বার্মায় থেকেও তা ভোলেননি।

শোভনার মা শুধু রাগ করতেন আমাদের ক্যারাম খেলা দেখলে। বলতেন, ওসব বসে বসে কুড়েমির খেলা কেন, ছুটোছুটি করো না।—আমরা তখন সারা বাড়ি জুড়ে লুকোচুরি খেলতাম, শোভনা বলত, যে আমায় প্রথম খুঁজে বার করতে পারবে, তাকে আমি একটা স্পেশাল প্রাইজ দেব!—এই কথা বলে শোভনা রহস্যময়ভাবে হাসত, আমি ভাবতাম, আমিই যদি ওকে প্রথমে খুঁজে না পাই

—তবে আমার সারা জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিন্তু মেয়েদের কথা লেখার জন্য এ লেখাটা শুরু করিনি। কুকুরের কথা —কুকুরও না, কাকের কথা।

যাই হোক, শোভনাকে দেখে মুগ্ধ হবার পর আমি কুকুরকেও ভালোবাসতে শুরু করি। শোভনাদের বাড়িতে একটা মাঝারি সাইজের কুকুর ছিল, আমি প্রথম সেটাকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে থাকতুম। কিন্তু সেটা জাতে কুকুর হলেও স্বভাবে ছিল বিড়াল—এমন বাধ্য। শোভনা হুকুম করত, স্ট্যাণ্ড আপ, টেডি। অমনি সোজা হয়ে দাঁড়াত। শোভনা বলত, শেক হ্যাণ্ডস, টেডি! কুকুরটা অমনি একটা হাত বাড়িয়ে দিত।

বস্তুত, শোভনার যে-কোনো হুকুম পালন করার জন্য আমি কুকুরটার চেয়েও বেশি বাধ্য ছিলুম তখন। কিন্তু শোভনাকে খুশি করার জন্যই, আমি কুকুরটার সঙ্গে ঝগড়া করিনি। কুকুরটার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে যায়। আমার জীবনে সেই প্রথম কুকুর বন্ধু।

এখন শোভনা কোথায় হারিয়ে গেছে, কিন্তু কুকুর জাতটার প্রতি আমার বন্ধুত্ব রয়েই গেছে। কোথাও কোনো বাড়িতে গিয়ে কুকুর দেখলে একটু আদর করতেই ইচ্ছে হয় এখন। মাথায় চাপড় মারি না বটে, কিন্তু মুখ দিয়ে চুঃ চুঃ শব্দ করি। এবং সব বাড়িতে গিয়েই গৃহস্বামিনীকে খুশি করার জন্য বলি, আমি অনেক কুকুর দেখেছি, কিন্তু এমন আশ্চর্য ভালো কুকুর কোথাও দেখিনি। কী সুন্দর চোখ দুটো, একেবারে মানুষের মতন।

আমাদের বাড়িতে কোনো কুকুর নেই, কিন্তু আজ সকালবেলা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচে একটা ছোট্ট কুকুর দেখতে পেলাম। একটা খয়েরি রঙের নেড়ি কুত্তার বাচ্চা নিচের রকে বসে কিউ কিউ করে ডাকছে।

পাশের বস্তির দু'তিনটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে সেটাকে খোঁচাখুঁচি করছে, একজন আবার ওটার ল্যাজে দড়ি বেঁধে টানছে। এসব কুকুরের বাচ্চারা যে কোথা থেকে আসে, কোথায় আবার যায়—কেউ জানে না!

সকালবেলার সব মানুষেরই মন একটু উদার থাকে। সুতরাং কুকুরের বাচ্চাটার প্রতি আমার বেশ খানিকটা দয়া হলো। ভাবলুম, বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে একটু ধমকে দিই। কিন্তু তখনই ওদের প্রতিও দয়া হলো। মনে হলো, আহা ওদেরও তো একটু খেলাধুলোর জিনিস পাওয়া দরকার। ওরা কুকুরটাকে নিয়ে খেলছে, খেলুক না। কুকুরটার যদি বাঁচার হয়, এমনিতেই বাঁচবে, কিংবা কপালে মৃত্যু থাকলে মরবেই।

পরক্ষণেই মনে হলো, এটা বেশি দয়ার বাড়াবাড়ি। অতএব বাচ্চাগুলোকে

বারণ করাই ঠিক করে, ওপর থেকে প্রচণ্ড এক ধমক লাগালাম। বাচ্চাগুলো পালিয়ে গেল।

তারপর মনে পড়ল, শুধু মনে মনে দয়া যথেষ্ট নয়। কুকুরটাকে কিছু খাওয়ানোও উচিত। কিন্তু সকালবেলা কুকুরের খাবার কোথায় পাব? ও আছে তো! পর পর পাঁচ দিন রুটি খেয়ে আমার মুখ পচে গেছে, কাল রাত্রে আর খেতে পারিনি। কাল রাত্রের রুটিগুলো এখনো টেবিলে পড়ে আছে। সেই কয়েকখানা রুটি নিয়ে এলাম।

অতটুকু বাচ্চা কি রুটি খেতে পারবে? এক টুকরো ছিঁড়ে গুলি পাকিয়ে ওর মুখের সামনে ছুঁড়ে দিলাম। বাচ্চাটা এসে রুটিটা কপাৎ করে গিলে, লোভীর মতন ওপরে তাকাল। আমি আর একটা টুকরো ছুঁড়ে দিলাম। আর, তখুনি একটা মজার ব্যাপার হলো।

একটা কাক কোথা থেকে টুক করে দ্বিতীয় রুটির টুকরোটা তুলে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এল আরো পাঁচটা কাক। পরের রুটির টুকরোও কাকের মুখে গেল। এর পর আরো কাকা এল, প্রায় পনেরো ষোলোটা কাক। এত কাকও যে কোথায় ছিল কে জানে। শুরু হলো ছিনিমিনি খেলা। আমি রুটির টুকরো গুলি পাকিয়ে ছুড়ে দিচ্ছি, কাকের দল মাঝপথে হাওয়া থেকেই সেটা মুখে লুফে নিচ্ছে। দু'একটা টুকরো দৈবাৎ পড়ছে কুকুরটার সামনে, সে সেটা খেয়ে নিয়ে কাকেদের দিকে তাড়া করে যাচ্ছে।

ব্যাপারটার মধ্যে একটা মজার খেলা পেয়ে আমার বেশ ভালো লাগল। আমি অনবরত রুটি ছুঁড়ে দিতে লাগলুম।

মাথার মধ্যে একটা ঝিনঝিনে শব্দ হতে লাগল, এই ব্যাপারটা থেকে কি যেন আমার মনে পড়ার কথা। কি যেন মনে পড়ার কথা, কি যেন, অমনি মনে পড়ল, হঠাৎ শোভনার কিশোরী মুখ। শোভনাদের বাড়ি, ওর মা, সেই লুকোচুরি খেলা। কিন্তু কাকদের ওড়াউড়ির সঙ্গে শোভনাদের বাড়ির কথা মনে পড়ার কি সম্পর্ক? কিছু একটা আছে, মনে করতে পারছি না, কিছু একটা।

যেই সেটা মনে পড়ল, অমনি আমি একা-একা হেসে উঠলুম। সত্যি যোগাযোগটা মজার। শোভনার মা একদিন নানারকম পায়েস আর পিঠে খাইয়ে বলেছিলেন, আজ নবান্ন, তোমাদের বাড়িতে এসব হয় না? নবান্নর দিন নতুন পায়েস খেতে হয় সবাইকে। শুধু নিজেরা নয়, পশুপাখিকেও খাওয়াতে হয়। খুব ছেলেবেলায় ঢাকায়, আমাদের দেশের বাড়িতে, আমরা নবান্নর দিন আমগাছতলায় দাঁড়িয়ে কাকদের ডাকতাম! এখন কলকাতায় কবে নবান্ন, তা টেরই পাওয়া যায় না! তোমরা যাও, ছাদে গিয়ে কাকদের খাইয়ে এসো আগে, শোভনা, যা ওদের

ছাদে নিয়ে যা।

কী আনন্দ লেগেছিল ছাদে সেদিন ছোটাছুটি করতে। নতুন চালের মিষ্টি গন্ধ আর শোভনার হাসির শব্দ একসঙ্গে মিলেমিশে আমার কৈশোরের সে দিনটাকে রঞ্জিত করে দিয়েছিল। নিচে নেমে আসার পর সবাই লাইন করে বসেছিলাম, শোভনার মা আমাদের পরিবেশন করেছিলেন। কি মিষ্টি ছিল তাঁর হাতের রান্না।

মজার কথা এই, আজও সেই নবান্নের দিন। সকালের খবরের কাগজেই সে কথা পড়েছি, আমাদের বাড়ির কারুর সে কথা মনেই নেই। নবান্নের দিন কাকদের নতুন চালের ভাত খাওয়ানো নিয়ম, না? কাকেরা বোধহয় সেই প্রতীক্ষাতেই ছিল। আমি না জেনেই তাদের বাসি রুটি খাওয়াচ্ছি।

১৯

এখনো মাঝে মাঝে আমি মশা মারতে গিয়ে নিজের গালে থাপ্পড় মেরে বসি। পেল্লায় সেই থাপ্পড়ের চোটে নিজেব গালটা যখন জ্বলতে থাকে, তখন নিজের ওপর না মশার ওপব, কার ওপর, যে বেশি রাগ হয়, বুঝতে পাবি না।

অনেক কিছুই এখনো বুঝতে পারি না। আমার দাদার ছোট ছেলে বিল্টু একটা ফড়িংয়ের ডানা ছিঁড়ে ফেলেছে নিষ্ঠুরভাবে, দেখে আমার এমন অসম্ভব শরীর শিউরে উঠল যে, আমি ঠাস করে ছেলেটির গালে এক চড় কষালুম। আমার চাষাড়ে হাত, ছেলেটার কচি মুখমণ্ডল মুহূর্তে রক্তিম হয়ে উঠল। টলটলে জলভরা দু'চোখে যত রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, কাকা, তুমি আমায় মারলে কেন?

কেন? মুখ ঝামটা দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তক্ষুনি মনে পড়ল, সত্যিই তো, ঠিক, কেন মারলুম? ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিকরা যখন গিনিপিগ খুন করে, তখন গিয়ে থাপ্পড় মারি? আমি নিজেই তো আই. এস-সি. পড়ার সময় কত ব্যাঙ কেটেছি। কেউ আমায় সেজন্য শাস্তি দিয়েছে? বরং, ব্যাঙ না কেটে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ফেল করলেই বহু শাস্তি পাবার সম্ভাবনা ছিল। বিল্টুর নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে ওর কি পদ্ধতি কে জানে? আজ ফড়িংয়ের ডানা ছিঁড়ছে, ভবিষ্যতে ও যে আর-একজন ডারুইন হবে না—তা কে বলতে পারে? সুতরাং আমি বললুম, আচ্ছা যা, বিকেলে তোকে চকলেট কিনে দেব 'খন!

আমার বন্ধু প্রদীপ মোটরগাড়ি কিনেছে, পথের মোড়ে দেখা হওয়ায় বলল, চল, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিই। বৃষ্টির পর সারা রাস্তা ভিজে ছপছপে, তবু পুজোর বাজারে অধার্মিক ক্রেতা-বিক্রেতার প্রবল ভিড়। রাস্তা গিসগিস করছে, গাড়ি চালানো সত্যিই মুস্কিল। এক ভদ্রমহিলা দুটি বাচ্চা নিয়ে একেবারে গাড়ির সামনে পড়েছিলেন, বিকট আওয়াজে ব্রেক কষে গাড়ি থামাতে একটুর জন্য দুর্ঘটনা হলো না। প্রদীপ রুক্ষ মুখে বলল, দেখলি কাণ্ডটা। যদি এক সেকেণ্ড দেরি হতো, পাবলিকের হাতে আমায় মার খেয়ে মরতে হতো! লোকে রাস্তা চলতে জানে না, যত দোষ ড্রাইভারের—

আমি বললুম, যা বলেছিস!! অধিকাংশ লোকই শহরে থাকার যোগ্য নয়। বিহারী মজুরগুলোকে দ্যাখ না—সব সময়েই যেন চান করতে যাচ্ছে, কাঁধে একটা গামছা। রাস্তায় হাঁটার সময় দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যখন তখন যেখানে সেখানে চুলকোবে! বাঙালগুলোও এতদিন কলকাতা শহরে আছে—অথচ রাস্তায় হাঁটার সময় যাবে একদিকে, তাকাবে আর একদিকে। সব কটা এণ্ডি-গেণ্ডি বাচ্চাকে নিয়ে পথে বেরুনো চাই—

প্রদীপ বলল, শুধু বাঙালদের দোষ দিস না, আমিও বাঙাল। কিন্তু ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার অভ্যেস কারুরই নেই। পুলিশের উচিত জেব্রা-ক্রসিং দিয়ে সবাইকে রাস্তা পার হতে বাধ্য করা। এত গাড়িঘোড়া কলকাতা শহরে—

আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে জোর দিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই! কতকগুলো সাধারণ ট্রাফিকের নিয়ম না জানলে কারুকে কলকাতা শহরে ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়। হা-হা করে মাঝ রাস্তা দিয়ে গল্প করতে করতে যাবে—হঠাৎ এপার থেকে ওপারে ছুটে যাবে, এদের ধরে ধরে শাস্তি দেওয়া উচিত।

অথচ, নিজে যখন আমি পায়ে হেঁটে যাই, তখন মোটরগাড়ির উৎপাতে আমার গা জ্বলে যায়। ফর্সা জামাকাপড় পরে পথের ধার ঘেঁসেই যাচ্ছি, কোথা থেকে একটা মোটরগাড়ি হুস করে কাদা ছিটিয়ে জামাকাপড়ে বাটিকের কাজ তুলে দিয়ে গেল! নিষ্ফল আক্রোশে আমি মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে তাকিয়ে থাকি সেই অপসৃয়মাণ গাড়িটার দিকে। তখন আমার মনে হয়, পথ তো পথচারীদের জন্যই। কলকাতা শহরে আর গাড়ি আছে কটা লোকের? পদযাত্রীরাই তো পথের মালিক। গাড়িওলাদেরই উচিত পথের লোকদের বাঁচিয়ে সাবধানে গাড়ি চালানো। যদি না পার, গাড়ি না চালালেই হয়!

তবে, আমি প্রদীপকে ও-কথা বললুম কেন? শুধু কি ওকে খুশি করার জন্যই! কোনো তো দরকার ছিল না, ওকে খুশি না করলেও ও তো আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিত ঠিকই। কিংবা, প্রদীপের বিপরীত কথা বললেই যে ও চটে

যেত, তারই বা মানে কি আছে? তাহলে ও-কথা বললুম কেন?

অনেক কেন'রই উত্তর জানি না। বারান্দা দিয়ে দেখলুম, একটা চড়ুই পাখি গুটি গুটি হাঁটছে। কাছে গেলেও উড়ল না। উড়তে শেখেনি। তা হলে তো বেড়ালের পেটে এক্ষুনি প্রাণ যাবে! তাড়াতাড়ি আমি চড়ুইয়ের বাচ্চাটাকে ঠাকুরঘরে এনে রাখলুম, জানলা বন্ধ করে। ওর খাবার জন্য চালের খুদ ছড়িয়ে দিলাম সামনে।

সে-সময় আমাদের কুচু নামে একটা পোষা বেড়াল ছিল খুব গুণ্ডা ধরনের। বেড়ালটা এমন ভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত যেন সব কথাই বুঝতে পারে। আমি তাকে কান ধরে শাসিয়ে দিলুম। আমি তাকে বললুম, দ্যাখ, এখন ক'দিন আমি তোকে না চিবিয়েই মাছের কাঁটা দেব, মাংসের হাড় একেবারে সাদা করব না, কিন্তু তুই খবরদার ঐ পাখিটাকে ধরতে যাবি না, বুঝলি।

কিন্তু বেড়ালের জাত তো। বিকেলের দিকে কোন ফাঁকে ঠিক ঢুকে পড়েছে, পাখিটার ওপর ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে আমি উপস্থিত! নিমকহারাম বেড়ালটার ওপর এমন রাগ হলো যে দরজার খিল দিয়ে আমি ওকে মেরে পা খোঁড়া করে দিলুম। বেড়ালটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে একেবারে বাড়ি ছেড়েই পালাল। মনে হলো, চড়ুইয়ের বাচ্চাটা আমার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

পরদিন সকালবেলাই দেখা গেল, পাখিটা মরে কাঠ হয়ে আছে। বেড়াল ওকে ছোয়ওনি। তবু মরল কেন? খাবারও তো দিয়েছিলুম, বেশ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। তবে?

একটু ভাবতেই বুঝতে পারলুম, সম্পূর্ণ দোষ আমারই। আমি পাখিটাকে খাবার দিয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু জল দিইনি। পুরো দেড়দিন জল না খেয়ে মানুষই বাঁচতে পারে কিনা সন্দেহ, এ তো একটা পাখি। বেড়ালটা খাদ্য হিসেবে পাখিটাকে মারতে গিয়েছিল স্বাভাবিক ভাবে, আর আমি অমনোযোগের সঙ্গে দয়া দেখাতে গিয়ে অকারণে পাখিটাকে মারলুম।

মরার পর পাখিটার চোখ সাদা হয়ে গেছে। কালকের বেড়ালমারা ভাঙা খিলটা দেওয়ালের এক পাশে দাঁড় করানো! বাড়ির কেউ যাতে আমাকে না দেখে ফেলে, আমার পাপের কথা যাতে পৃথিবী জানতে না পারে, তাই আমি চুপি চুপি পাখিটার পা ধরে তুলে নিয়ে ছাদের কোণে ফেলে আসতে যাচ্ছিলুম। একগাদা চড়ুই আমার পর ওড়াউড়ি করে আমার অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। ছাদের পাঁচিলের ওপর বেড়ালটা বসে আছে, অলস চোখ তুলে আমাকে দেখে বেশ দীর্ঘ মীড় খেলানো গলায় বলল, মিঁ—আ—ও—ও!

তৎক্ষণাৎ পশুপক্ষীর ভাষা আমার শেখা হয়ে গেল। আমি বেড়ালটার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। চোখের মণিটা বিন্দুর মতন ছোট করে, অদৃশ্য ভুরু কুঁচকে বেড়ালটা আমাকে বলছে, খুব তো নকল দয়া দেখাতে যাওয়া হচ্ছিল, এখন! শুধু শুধু আমাকে মারলে কেন? আবার, কেন? আর পারি না। আশেপাশে কোনো মশা নেই, তবু আমি নিজের গালে কষে এক থাপ্পড় বসালুম। আর কোনো যুক্তিটুক্তির মধ্যে যাচ্ছি না আমি। পৃথিবীতে যা চলছে তাই চলুক। এসব 'কেন'র উত্তর খুঁজতে মাথাটা না খারাপ হয়ে যায়!

২০

ল্যান্সডাউন রোডে একটা বড়ো গাড়ি-বারান্দাওয়ালা বাড়ির সামনে লোহার গেট। গেটের মাথায় এবং দেয়ালে মাধবীলতার ঝোপ। গেটের ওপাশে একটি নারী। সেই নারী দু'হাতে লোহার গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, বয়েস তিরিশের কাছাকাছি – একটু ভারি স্বাস্থ্য, মাথায় ঘন থোকা-থোকা চুল, খুব ফর্সা রং, রাত্রি ন'টার অন্ধকারে তাঁর মুখখানি যেন গন্ধরাজ ফুলের মতন ফুটে আছে। এ সবই আমার এক পলকে দেখা।

গেটের বাইরে, রাস্তার উপর একটি যুবক দাঁড়িয়ে! যুবকটিও ভারী রূপবান, দৃঢ় স্বাস্থ্য, দীর্ঘ দেহ। প্যান্ট ও শার্ট-পরা, কিন্তু দেখলে মনে হয়, কিছু আগে গলায় টাই বাঁধা ছিল। কি করে একথা মনে হয়, তা আমি বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমার নিশ্চিত মনে হলো বিকেল পর্যন্ত যুবকটি টাই বাঁধা অবস্থায় সুসজ্জিত ছিল, একটু আগে খুলে রেখেছে। যুবকটির দাঁড়ানোর ভঙ্গি একটু অদ্ভুত। সে গেটের ওপাশের মহিলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে পাশ ফিরে, যদিও তার একটি হাত গেটের লোহার শিক ধরা।

তবে ওই দুজনের দাঁড়ানো বেশ ঘনিষ্ঠ ছবির মতন, মহিলা তাঁর মুখ চেপে ধরছেন গেটের ওপর, তাঁর মুখের খুব কাছেই যুবকটির হাত। এই দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটি মিষ্টি দুঃসাহস আছে, রাত্রি ন'টায় অসংখ্য পথচারীর দৃষ্টিকে গ্রাহ্য নেই। সেই বাড়ির লোকেরও কারুর কোনো আপত্তি থাকলে ওরা তুচ্ছ মনে করেছে।

এ সবই আমার এক পলকের দেখা। আমি ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে হেঁটে আসছিলুম, হঠাৎ ওদিকে চোখ পড়ল! এ রকম দৃশ্য ফিল্মে খুব দেখা যায়, কিন্তু রাত ন'টায় কলকাতায় দেখতে পেয়ে ভারী ভালো লাগল! কিন্তু যখন আমার

চোখে পড়েছে, তখন আমি ওদের খুবই কাছাকাছি, একটু বেশিক্ষণ ধরে দেখার জন্য গতি শ্লথ করতে পারি না, তা ছাড়া সেই মহিলার মুখের দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করাও ভদ্রতাসম্মত নয়।

সুতরাং আমি ঘাড় নিচু করে খুবই নাগরিক ভঙ্গিতে, যেন আমি ওদের দেখতেই পাইনি এইভাবে—ওই জায়গাটুকু পেরিয়ে এলুম। কিন্তু আমার শ্রবণেন্দ্রিয় ছিল ধনুকের ছিলার মতন টানটান, ইঁদুরের মতো উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম ঐটুকু সময়। আমি দুটি আশ্চর্য কথা শুনতে পেলুম। মহিলাটির গলা কান্নাবিজড়িত, মনে হয় তিনি অনেক দিন ধরে কাঁদছেন, মহিলাটি কান্নায় ভাঙা গলায় বললেন, সত্যিই তুমি পারো না?

ছেলেটি স্পষ্ট অথচ চাপা গলায় বলল, না, আমি যে বিদেশী!

তারপর আমি একা হাঁটতে হাঁটতে বহু দূর চলে গেলাম। একবারও পিছন ফিরে তাকাইনি। হয়তো, আর ইহজীবনে ঐ দুজনকে দেখব না। দেখলেও চিনতে পারব না—ওরা যদি মোটরগাড়ি চেপে হুস্ করে চলে যায় আমার চোখের সামনে দিয়ে, কিংবা দেখা হয় রেলের কামরায়, কিংবা বোটানিকাল গার্ডেনের পিকনিকে দেখি ওদের হুড়োহুড়ি করতে, আমি চিনতে পারব না। কারণ, আমার চোখে ভেসে আছে ঐ অদ্ভুত দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি, মহিলাটি গেটে মুখ চেপে, যুবকটি পাশ ফিরে—এবং দুটি বাক্য, সত্যিই তুমি পার না?—না, আমি যে বিদেশী!

পৃথিবীর কঠিনতম ধাঁধার মতো ঐ দুটো কথা। কী ওর মানে? দুজনেই কথা বলছিলেন বাংলায়। উচ্চারণে সামান্যতম জড়তা ছিল না, ওদের বাঙালি না-হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই, তবু ছেলেটি কেন বলল, না, আমি যে বিদেশী! মহিলাটি কেঁদে কেঁদে যুবকটির কাছে কী প্রার্থনা করছিলেন? উদ্ধার? কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেই বাড়ির গেট একপাল্লা খোলা ছিল, মহিলাটি অনায়াসে বাইরে আসতে পারতেন, যুবকটি যেতে পারত ভিতরে, তবু ওরা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল সমকোণে, লোকচক্ষু বা বাড়ির শাসন অবহেলা করে। মহিলাটির চোখে জল। এবং নিশ্চিত বাঙালি হয়েও ছেলেটি উদাস গলায় বলল, না, আমি যে বিদেশী!

সেই দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটি ও দুটি মাত্র সংলাপে কি যেন এক গভীর দুঃখের সুর ছিল। দুঃখ মানুষকে বড়ো কাছে টানে। আমি তো আনন্দের দৃশ্যও কম দেখিনি। গিয়েছি কার্নিভালে, মেলায়, সমুদ্রতীরে। দেখেছি উচ্ছল, সুখী, মানুষ-মানুষীর মুখ। দেখেছি পার্টিতে দৃপ্ত যুবা-যুবতীর নাচ, এরোপ্লেনের সীটে দেখেছি কলহাস্যময় নবীন দম্পতি, সমুদ্রপারে খুশি-চঞ্চলা পুরুষের বাহুলগ্না নারীর এমন খলখল হাস্য শুনেছি—যার কাছে সমুদ্রের গর্জনও ম্লান হয়ে গেছে।

কিন্তু তাদের অধিকাংশ মুখ মনে পড়ে না। কিন্তু চকিতে শোনা দু-একটা দীর্ঘশ্বাস বা চাপা কান্না—সেই সব মুখ বা ভঙ্গি কিছুতে ভুলতে পারি না। খুব জানতে ইচ্ছে করে, তাদের গল্পটা কী। দুঃখের মধ্যে যেন একটা অফুরন্ত গল্প সব সময়েই রহস্যময় বহু বিচিত্র, আদি অন্তহীন।

আর একটা দৃশ্য মনে পড়ে। এক সময় আমার খুব মাথা ধরতো সন্ধের দিকে। ভেবেছিলাম, এবার বুঝি চশমা নিতে হবে। কিন্তু তখনো আমার দৃষ্টিশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে, মাথা ধরা অবস্থাতেও এক মাইল দূরে কোনো শাড়ির আভাস দেখতে পেলে বলে দিতে পারতুম, মেয়েটির বয়েস কত। সুতরাং অনেকে বললে, চোখের অসুখ ছাড়াও অন্য কারণে মাথা ধরতে পারে, ডাক্তার দেখাও!

ডাক্তার জাতিকে আমি সাধারণত এড়িয়ে চলি। কারণ সাধারণভাবে আমার ধারণা ছিল, ডাক্তারদের হৃদয় নেই।

যাই হোক, ডাক্তারদের কাছে যেতে হলে খুব বড়ো ডাক্তারের কাছে যাওয়াই ভালো—এই ভেবে, কলকাতার একটি বড়ো হাসপাতালের একজন বিখ্যাত ডাক্তার সপ্তাহে একদিন আউটডোরে বসেন খোঁজ নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তখন প্রায় দুপুর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক্তারের ঘরে আমার ডাক পড়ল।

ঘরে ঢুকেই আমি বুঝতে পারলুম, এখানকার আবহাওয়া অন্যরকম। কি যেন একটা নাটক এখানে অনুষ্ঠিত হবে এখুনি। ডাক্তারটি প্রায়-প্রৌঢ়, কিন্তু সুকুমার মুখ, টেবিলে বসে কী যেন লিখছেন। আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে, সেও ডাক্তার, কেননা বুকে স্টেথস্কোপ ঝোলানো, এক পাশে দাঁড়িয়ে।

এই দৃশ্যের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই, কিন্তু সেই দুজন নারী-পুরুষের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারলুম, এখানে একটা গভীর নাটক আছে। মেয়ে-ডাক্তারটি অত্যন্ত সুন্দরী, তেজী চেহারা, কিন্তু কী অস্বাভাবিক বিষণ্ণ মুখ! ঠোঁটে ঠোঁট চাপা, দু' চোখে যেন পাতলা জলের পর্দা, এমন দীর্ণ কাতর মুখ আমি বোধহয় কখনো দেখিনি। আমার বুকের মধ্যে নীরব তীক্ষ্ণ আর্তনাদ জেগে উঠল, ইচ্ছে হলো আমি মেয়েটিকে বলি, কী তোমার দুঃখ? এমন কঠিন দুঃখও মানুষ পায়?

ডাক্তারের মুখ রেখাহীন, গম্ভীর। টেবিল থেকে চোখ তুলে আমাকে বললেন, বলুন?

আমি একটিমাত্র বাক্যে আমার রোগের কথা জানালুম। কিন্তু, তখন আর আমার কোনো কথা বলার ইচ্ছে ছিল না, ইচ্ছে ছিল না চিকিৎসার। বরং ইচ্ছে করছিল, তখুনি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আমি যেন একজন দর্শক, হঠাৎ

ভুল করে নাটকের মাঝখানে মঞ্চের ওপর উঠে পড়েছি, আমার উপস্থিতি যেন আমারই লজ্জা।

ডাক্তার কড়িকাঠকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ব্লাড পেসারটা দেখা দরকার।

মেয়ে ডাক্তারটি আমাকে একটি অয়েল ক্লথ মোড়া বিছানা দেখিয়ে খুব আস্তে বললেন, শুয়ে পড়ুন। আমি নির্দেশ মান্য করলুম, মেয়েটি আমার বাহুতে কাপড়ের পাট জড়াতে লাগলেন। আমি শুধু মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কি ক্লান্ত, অলসভাবে তিনি আমার হাতে ব্যাণ্ডেজ জড়াচ্ছেন, যেন, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁর হাত থেকে যন্ত্রটা মাটিতে পড়ে যেতে পারে, যে-কোনো মুহূর্তে দু'হাতে মুখ চেপে তিনি কেঁদে উঠতে পারেন। তাই তাঁর করা উচিত।

আমি মনে মনে বললুম, কী দরকাব তোমার আমাকে দেখার, তুমি যাও, কোনো নির্জন প্রান্তরে গিয়ে কিছুক্ষণ কেঁদে মন হালকা করে এসো।

এক সময় পুরুষ প্রৌঢ় ডাক্তারটি হঠাৎ বললেন, বেবা, যদি তোমার শরীর খারাপ লাগে, তা হলে আমিই ব্লাড পেসারটা দেখে নিচ্ছি।

মেয়েটি মুখ না ফিরিয়েই স্পষ্ট গলায় বললেন, না, আমার শরীর খুব ভালো আছে।

ওরা ডাক্তার, ওরা হৃদয়হীন, ওরা শরীর ছাড়া অন্য কথা জানে না। ওরা মন খারাপের কথা জিজ্ঞেস করে না, জানতেও চায় না, ওরা শুধ্ জানে শবীর ভালো আছে, না খারাপ আছে। শবীব, শরীর, হাসপাতালে শুধু শরীরেব গন্ধ।

কোনো ওষুধ না খেয়েই তিন দিন বাদে আমার মাথাধবা সম্পূর্ণ সেরে যায়। কারণ, আমি খবরের কাগজে পড়লুম সেই মেয়ে ডাক্তারটি আত্মহত্যা করেছে। কারুকে দায়ী করেনি, সে নিজে একা-একা চুপ করে মবে গেছে। কিন্তু, তাকে আমি কেন যে দেখেছিলাম! মেয়েটি মরে গেল, কিন্তু তার সেই বিষণ্ণ মুখখানা চিরকালের জন্য ঢুকিয়ে গেল আমার মাথার মধ্যে!

২১

এক-একটা দিন আসে একেবারে অন্যরকম। সেদিন সমস্ত নিয়মকানুন উল্টে-পাল্টে যায়। সেই সব হঠাৎ-আসা দিনগুলোর জন্যই মানুষের প্রতি বিশ্বাস, আশা, সমবেদনা এইসব ভালো ভালো জিনিসগুলো টিমটিম করে টিকে আছে।

দিন চারেকের জন্য একটা মফস্বল শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আজকাল বিশেষ কিছু আশা করি না বলে তেমনভাবে বঞ্চিতও হই না। সুতরাং বেড়াতে

গিয়ে যেটুকু ভালো লাগা উচিত, সেটুকু ঠিকই ছিল।

ফেরার ট্রেন রাত সাড়ে দশটায়, সেটা মিস করলুম, সেই প্রথম দুর্ঘটনা। অথচ পরদিন কলকাতায় ফিরতেই হবে।

পরের ট্রেন ভোর পাঁচটায়, সেটা ধরতেই হবে। আলার্ম ঘড়ি এবং মাত্র একদিনের আলাপ হওয়া ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্যে রাত চারটেয় উঠে আবার স্টেশনে এলুম। এবার আমার দেরি হয়নি, ট্রেনের দেরি হচ্ছে। এই সব ব্যাপারে বেশ রাগ হয়—গত রাত্রে সাড়ে দশটার ট্রেন, আমি মাত্র দেড় মিনিট আসতে দেরি করেছিলুম বলে আমায় ফেলে রেখে চলে গেল, এমনই তার ব্যস্ততা। অথচ আজ যে ট্রেন নিজেই আসতে দেরি করছে—তবু আমি তাকে ফেলে চলে যেতে পারব না, আমাকে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকতেই হবে!

তার ওপর অসম্ভব শীত—কোট, কম্ফর্টার ভেদ করে ঢুকছে শীতের সূচ, একটা কথা বলতে গেলেই সোরি মিঞার টপ্পার মতন গলা কাঁপছে।

খুবই ছোট্ট স্টেশন, কোনো আরামপ্রদ ঘেরা বিশ্রামঘর নেই, দু-পাশ খোলা একটা জায়গার নাম ওয়েটিং রুম, বারোয়ারি রাস্তার মতন সেখান দিয়ে অবিরাম বাতাসের যাতায়াত চলছে। বিশেষ কোনো লোক নেই, কিছু আদিবাসী ঐ শীতের মধ্যেও মেঝেতে ছেড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। একটু কুকুর একজনের কম্বল ফাঁক করে সেখানে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি ছাড়া আর একমাত্র জাগ্রত ব্যক্তি—কাউন্টারের রেলবাবুটি। যেন সমস্ত দোষটাই তার—এইভাবে তার দিকে রাগের চোখে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলুম। গরম ঘরের মধ্যে আরামে বসে লোকটি আমার শীতকাতর অবস্থাটা দেখে মজা পাচ্ছে!

হঠাৎ লোকটি জানলা থেকে সরে গেল, একটু বাদে দেখলুম বাইরে। আমার কাছাকাছি এসে লোকটি বলল, ওরেঃ বাপ, কী ভয়ঙ্কর শীত পড়েছে আজ। যাবার আগে শেষ কামড় দিয়ে যাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ট্রেন আর কত লেট করবে?

—কী জানি, বলতে পারছি না। আগের স্টেশনেই তো এখনো বাঁচ করেনি। লোকটা উদাসীনভাবে হাত-ঘড়ি দেখে আবার বলল, উঃ, কী শীত, কী শীত। এক কাজ করুন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন কষ্ট পাবেন? আসুন, অফিস-ঘরে এসে বসুন!

এবার আমার অবাক হবার পালা। রেলের যে-সব কর্মচারী রাত্রিবেলা জেগে থেকে কর্মপরায়ণতা দেখায়, তাদের অনেকেই যে আসলে ঘুষখোর হয়—এ সম্পর্কে আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে। ঐ লোকটিকেও আমি সেই চোখেই দেখছিলুম। কিন্তু হঠাৎ আমাকে ঘরে বসতে বলার নিমন্ত্রণ? তাছাড়া আমার ফার্স্ট

ক্লাসের টিকিটও নয়, থার্ড ক্লাস, সুতরাং অতিরিক্ত খাতির দেখাবার কোনোই কারণ নেই। মাটিতে শোওয়া লোকগুলিকে দেখে লোকটি বলল, মাটির মধ্যে কি করে এরা শুয়ে আছে, ভগবানই জানে! এই ঠাণ্ডায় মানুষ বাঁচে? এজন্যই তো এদের প্রায় সবকটা প্লুরিসিতে ভোগে।

লোকটি নিচু হয়ে হাত দিয়ে কম্বল মোড়া এক-একটি মূর্তিকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে জাগাতে বলল, এই, ওঠ, চল, অফিস-ঘরে চল!

সবাই মিলে ঘরে বসলুম, দরজা-জানলা বন্ধ করার ফলে বেশ আরাম লাগতে লাগল। ঘরের মধ্যে চা তৈরি করার বন্দোবস্ত ছিল। লোকটি নিজের হাতে চা তৈরি করে সকলকে খাওয়ালেন, সাঁওতাল কুলিগুলো সমেত। কৃতজ্ঞতায় আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়। লোকটির ব্যবহার এমনি যেন এ-সবগুলো খুবই স্বাভাবিক—এর জন্য তার কোনো ধন্যবাদ প্রাপ্য নেই। আমার মনে হচ্ছিল, লোকটি যেন রেল কোম্পানির প্রহ্লাদ। পরে আমার আবার মনে হলো—হয়তো এরকম ভদ্রলোক আরো অনেক আছেন, কিন্তু সময়মতো আমাদের চোখে পড়ে না—শুধু খাবাপ, ঘুষখোর লোকগুলির সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি হতে হয়।

দিনটা শুরু হলো এইভাবে। বিস্ময়ের পর বিস্ময় সেদিন আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। ট্রেন এল পয়তাল্লিশ মিনিট লেট করে এবং বিষম ভিড়। কিন্তু ওঠা মাত্র জায়গা পেয়ে গেলুম। কারুর সঙ্গে ঝগড়া কিংবা ঠেলাঠেলি করতে হলো না, দু-তিন জন যুবক অপ্রত্যাশিতভাবে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নিন, আপনারা বসুন, আমরা সারারাত আরামে বসে এসেছি।

আমিই তখন অপ্রস্তুতভাবে বললুম, না না, আপনারা জায়গা ছাড়বেন, মানে, দাঁড়িয়ে যাবেন কেন? বসুন না, এরই মধ্যে...

যুবকেরা বলল, না, না, আমরা এমনিই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সূর্য-ওঠা দেখব।

হঠাৎ কি রাতারাতি সব কিছু বদলে গেল? কোথায় আছি? ভারতবর্ষে না স্বর্গে? বসে বসে এই সব ভাবছিলুম, হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনের স্পীড কমে এল এবং অবিলম্বে থামল মাঠের মধ্যে। কোথাও স্টেশনের চিহ্ন নেই, তবু ট্রেন থামল কেন?

দরজার কাছে যুবকরা চেঁচিয়ে উঠল, এই বিমল তুই ঐ গেটে যা, কেউ চেন টানছে, দ্যাখ, কোন কামরা দিয়ে নামে—আজ ধরব শালাদেব—

আমি নিশ্চিত হলুম। এই তো ভারতবর্ষে আছি, স্মাগলাররা ঘন ঘন চেন টেনে গাড়ি থামাবে, তাদের কেউ থামাতে পারবে না—

—ঐ যে একজন নামছে, ঐ যে, ধর শালাকে—

যুবকেরা বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে নেমে গেল। আমিও উঁকি মারলুম। একজন খাকি পোশাক-পরা লোক একটা বড়ো বস্তা ঘাড়ে করে রেল লাইন পার হয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। যুবকেরা গিয়ে তাকে চেপে ধরেছে, চেঁচিয়ে বলছে, গার্ড সাহেবকে ডাক, কোথায় গার্ড সাহেব—আজ এ ব্যাটার পঞ্চাশ টাকা ফাইন করতে হবে।

দেখা গেল পলাতক আসামীটি স্মাগলার মোটেই না, বরং তার উল্টো। রেলওয়ে প্রোটেকশান ফোর্সের লোক, ডিউটির শেষে বাড়ির কাছে নামবার জন্য চেন টেনেছে। ততক্ষণে সেখানে বিরাট ভিড়, বিরক্ত যাত্রীরা মন্তব্য করছে, রেল তোমার বাবার সম্পত্তি ? চলো আজ তোমার নামে রিপোর্ট হবে—যেখানে সেখানে চেন টানা ? আর. পি. এফ. হয়ে মাথা কিনেছ ? গার্ড সাহেব একপাশে দাঁড়িয়ে, তিনিও চান লোকটি ফাইন দিক অথবা পুলিসের হাতে ধরা পড়ুক। লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে দোষ স্বীকার করে বলল, তার কাছে ফাইন দেবার টাকা নেই এবং পুলিসে ধরালে তার চাকরি যাবে।

এরপর যে-ঘটনাটা ঘটল তাকে সত্যিকারের গণতন্ত্রের একটি সার্থক উদাহরণ বলা যায়। ট্রেনের সমস্ত যাত্রী কামরার দরজার জানালায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, অনেকে নেমে এসেছে নিচে—তাদের সমক্ষে লোকটির বিচার হলো। লোকটি দোষ করেছে ঠিকই—কিন্তু সেই দোষে ওর চাকরি যাক—তা কেউ চায় না। কিন্তু ওকে বেকসুর খালাস দেওয়াও চলে না। সুতরাং ঠিক হলো, লোকটি কান ধরে পঞ্চাশবার ওঠ-বোস করবে সবার সামনে, যাতে আর কখনো যেন বিনা কারণে চেন টানবার সাহস কারুর না হয়! পঞ্চাশ টাকা জরিমানার বদলে পঞ্চাশ বার কান ধরে ওঠ-বোস। হাজার হাজার যাত্রী উল্লাসে সমর্থন জানিয়ে লোকটির প্রতিবারের ওঠা-বসা গুণতে লাগল—ছয়, সাত...তেইশ, চব্বিশ...

মনটা আমার শান্তিতে ভরে গেল। এইভাবে যদি ভারতবর্ষের সব সমস্যার সমাধান করা যেত। পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই একটা স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়া আছে।

কিন্তু আমার জন্য আরো চমক অপেক্ষা করছিল। দুর্গাপুর স্টেশন থেকে ট্রেন বদল করার জন্য আমি প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছিলুম। এই সময় একটা ছোট ভিড় চোখে পড়ল। এগিয়ে গেলুম।

একটি হিন্দুস্থানী যুবতী হাপুস নয়নে কাঁদছে। বছর তিরিশেক বয়েস, লাল ফুল-ছাপা শাড়িপরা শক্ত চেহারার নারী, পায়ে রুপোর মল, কিন্তু কাঁদছে একেবারে দীনহীন অবলার মতন। তাকে ঘিরে কয়েকজন রেলওয়ে পুলিশ—দ্বিতীয় দেয়ালটি কৌতূহলী জনতার।

এখানেও আর. পি. এফ.! এরাই যত গণ্ডগোলের মূল দেখছি! ব্যাপারটা

জানা গেল, ঐ নারীটি দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকে দুর্গাপুরে আসছিল কাজ খুঁজতে, কিন্তু যে পুটুলীর মধ্যে তার যথাসর্বস্ব ছিল—সেটা ট্রেন থেকে চুরি হয়ে গেছে। তার যথাসর্বস্ব মানে দু'খানা শাড়ি, তেরটা টাকা, একটা কম্বল আর একটি ঘটি। আর. পি. এফ.-এর লোকরা চোরাই চাল খুঁজতে ওকে ধরতেই এই ফ্যাসাদে পড়েছে। মেয়েটির কান্না কিছুতেই থামে না।

রেলের একজন টিকিট চে··'ও ভিড়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, ও কি আর পাওয়া যাবে? যত চোরের রাজত্ব এ লাইনে। এই, এই নে—আজকের দিনটা চালা--! চেকারবাবু নিজের পকেটে যা খুচরো পয়সা ছিল দিয়ে দিল মেয়েটিকে। দেখাদেখি আরেকজন। আমি স্তম্ভিত। হঠাৎ কি কাল শেষ রাত্রে কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগ শুরু হলো? টিকিট চেকাররা চিরকাল হাত বাড়িয়ে ঘুষের টাকা নিতেই অভ্যস্ত। তারাও যে কখনো নিজের পকেট থেকে টাকা বার করে বিনা কারণে অন্যকে দেয়—এ রকম কখনো দেখিনি, শুনিও নি! আমারও কিছু একটা করা উচিত বলে আমি পকেটে হাত দিলুম।

জনতার অনেকেই মেয়েটিকে চাদা দিতে লাগল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। মেয়েটা নাচ দেখাচ্ছে না, ভেলকি দেখাচ্ছে না, শুধু কাঁদছে—তার জন্যই সাহায্য!

এই সময় আর একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার প্রৌঢ়া মহিলা—দুর্গা প্রতিমার মতন আয়ত প্রশান্ত তাঁর মুখ—তিনি এসে বললেন, আহা, মেয়েটি কাঁদছে কেন? সব চুরি হয়ে গেছে? দুর্গাপুরে এসেছে কেন?—কাজ খুঁজতে?—ঠিক আছে, এই, তুই চল আমার বাড়িতে থাকবি। খাবি, কাজ করবি। যদি পছন্দ না হয় অন্য জায়গায় পরে কাজ খুঁজে নিস—যে কদিন না পাস আমার বাড়িতে...আয় কাঁদিস না, আয়—

একটু আগে আমি একটা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। সেটা না পড়েই ট্রেন লাইনে ফেলে দিলাম। আজ সকালে এ পর্যন্ত কোথাও কোনো অশান্তি নেই, অবিচার নেই, মানুষে মানুষে হিংসা নেই—বড়ো প্রীতিময় আজকের এই সকালবেলা। একমাত্র খবরের কাগজেই দেখতে পাব যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঈর্ষা-কোন্দল, লোভ আর জোচ্চুরির কাহিনী। যাক, আজ আর কাগজ পড়ব না—মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস ফিরে আসুক।

একটা বিখ্যাত কবিতার কয়েক লাইন বার বার মনে পড়তে লাগল: পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো/ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু/দেখেছি আমারই হাতে হয়তো নিহত/ভাই বোন বন্ধু, পরিজন পড়ে আছে/পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন/মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

২২

আমাদের বাড়ির সামনে খানিকটা গাছপালায় ভরা জমি পড়ে আছে। জমিই বললুম, গাছপালা সত্ত্বেও তাকে বাগান বলা যায় না। কয়েকটি এলোমেলো বড়ো বড়ো রকমারি গাছ, বাকি জায়গাটা জুড়ে কচু-ঘেঁচু-এরণ্ড'র আগাছা।

ফ্ল্যাট বাড়ি তো, তাই কেউই আগাছা পরিষ্কার করে বাগান করেনি। চারপাশের দেয়াল ভাঙা বলে কিচেন গার্ডেনিং করার চেষ্টাও হয়নি।

জানলা দিয়ে তাকালে এখন চোখে পড়ে, আগাছাগুলো ক্রমশ শুকিয়ে দড়ির মতন হয়ে আছে। অন্যান্য আসল গাছের চেয়েও আগাছার রং বেশি গাঢ় দগদগে সবুজ থাকে, এখন সেগুলো বিবর্ণ চকলেট রঙের, কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বেশিদিন বৃষ্টি না পড়লেই ওরা মরে যায়। বুঝতে পারলুম, শীত আসার দেরি নেই।

আঃ, শীত আসছে, ভাবলেই এত ভালো লাগে। এই কলকাতা শহরে শীতকালই তো একমাত্র সুখের সময়। শীতকালে ট্র্যাফিক জাম হয় না, শীতকালে আন্দোলনও খুব কম হয়, শীতকালে রাগ কম হয়, অনেক বিচ্ছিন্ন প্রেমের পুনর্মিলন হয়ে যায়।

আঃ, শীতকাল আসছে ভাবলেই এত ভালো লাগে! শীতকাল হচ্ছে ফুলকপির সময়, টাটকা মাছের সময়, ছেলেবেলায় খেজুর রস খাবার স্মৃতি অনুভবের সময় (বড়ো বয়সে খেজুর রস খেয়ে দেখেছি, যাচ্ছেতাই লাগে। কিন্তু ছেলেবেলায় খেজুর রস খেয়ে যে কি খুশি হতুম সেই কথা মনে পড়লে আনন্দে মনটা ভরে ওঠে) শীতকালে কোথাও পচা বা নোংরা জিনিস থাকে না, ধুলো থাকে না, শীতকালে শুধু আগাছা মরে যায়—আর সব কিছু সজীব হয়ে ওঠে।

সত্যি, আমাদের বাড়ির মাঠে যে-কটা বড়ো বড়ো গাছ সেগুলো সবই চিরহরিৎ, পাতা খসে না। আম-পাম-জাম, বেল-নারকোল-কুল-নিম, এদের কারুর পাতা ঝরে না। শুধু আগাছাগুলো মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, ভালোই।

শীতকাল কে বলেছে বিবর্ণ? শীতকালই তো রঙের সময়! আমরা বাঙালিরা পোশাকে সাধারণত বেশি রং পছন্দ করি না, তাই সারা বছর সাদা বা সাদার কাছাকাছি হাল্কা রং। কিন্তু শীতকালের গরম জামায় রঙের খেলা, শীতকালে লাল সোয়েটার, কালো শার্ট বা নীল আলোয়ানকে কেউ বলবে না ক্যাটকেটে। গরম জামাকাপড়গুলো এবার আস্তে আস্তে নামাতে হবে। কোটটা কাচানো আছে তো? লন্ড্রি থেকে গতবছর কাচতে দেওয়া শালটা আনা হয়েছে কি?

দুপুরের দিকে এক-একদিন লোভী ইচ্ছে হয়, আজ স্নান না করলে হয় না? বুঝতে পারি শীত এসে গেল। নাঃ, এর মধ্যেই স্নান বাদ দিলে লোকে যা-তা

কুঁড়ে বলবে, আর কয়েক সপ্তাহ যাক, তারপরেই মাঝে মাঝে স্নান বাদ দিয়ে মৌজ করতে হবে। ছেলেবেলায় পুকুর পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, কিছুতেই স্নান করতে ইচ্ছে করত না, তখন জলের মধ্যে গামছাটা ছুঁড়ে দিতুম, আস্তে আস্তে ডুবত, যখন দেখতুম আর উপায় নেই, তখন ঝাঁপিয়ে পড়তেই হতো। এখন সে-সব ঝঞ্ঝাট নেই, বাথরুমে ঢুকে ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছে এলেই হলো!

আসন্ন শীতের আমেজটা ক'দিন ধরেই উপভোগ করছিলুম। শীত আসছে, শুধু এই জেনেই মনটা খুশি-খুশি হয়ে উঠছে। শীত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কি কি গান আছে মনে করার চেষ্টা করে গুনগুন করে সুর ভাজছি। 'শীতের বনে কোন সে কঠিন আসবে বলে...শিউলি ফোটা আ, আ, ফুরোলো রে ফুরোলো'...রবীন্দ্রনাথের শীতকালের গানগুলোয় যেন একটু দুঃখ-দুঃখ। খালি বসন্তের জয়। কিন্তু শীতকালে দুঃখের কি আছে ? শীতকালই তো আনন্দের সময়—ভালো খাওয়া, ভালো ঘুম, ভালো পোশাক, ভালো প্রেম। বসন্তে কি আছে কলকাতায় ? কিচ্ছু নেই, শুধু চিড়বিড়ে রোদ্দুর।

একটু বেশি রাত্রে বাসে আসতে আসতে ঠাণ্ডা হাওয়া ভোগ করছিলুম। একে তো বসার জায়গা পেয়েছি, তা ছাড়া ঠাণ্ডা হাওয়া—এমন সৌভাগ্য এক বছর হয়নি। পাশে বন্ধু ছিল, সে হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে বলে উঠল, আচ্ছা, ওরা শীতকালে কোথায় যায় বলত ?

আমি অন্যমনস্কভাবে বললুম, কারা ?

—ঐ যে দ্যাখ না, ঐ যারা শুয়ে থাকে ?

আমি জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিলুম। রাস্তার ওপর যে-কটি বাড়ির গাড়িবারান্দা আছে (গাড়িবারান্দা বলে কেন ? ফুটপাতের ওপর বারান্দা, তার তলায় কি গাড়ি থাকে ?) সবগুলো বারান্দার নীচে মানুষ শুয়ে আছে। যেন কখনো দেখিনি, এই ভঙ্গিতে আমি উদগ্রীবভাবে লক্ষ করে দেখে বললুম, কোথায় আর যাবে ? কাছেই থাকবে !

বন্ধু বলল, ভ্যাট! শীতকালে কাউকে রাস্তায় শুতে দেখেছিস ?

—রাস্তায় শোবে না তো যাবে কোথায় ?

—যা যাঃ! আমরা ঘরে একটা জানলা খুলে পর্যন্ত শুতে পারি না শীতকালে, আর ওরা রাস্তায় শোবে, চালাকি পেয়েছিস ?

—ঘরের মধ্যে বেশি শীত, রাস্তায় অতটা শীত করে না, সারাদিন রোদ্দুরে তেতে থাকে তো!

বন্ধু বেশ রেগে উঠে বলল, বাজে বকবক করিস নি! এমন ভাবে বলছিস,

যেন তুই নিজে কত রাস্তায় শুয়েছিস! রাস্তাটা না হয় তেতে থাকে, আর যে কনকনে উত্তুরে হাওয়া দেয়—

—কে জানে, তখন ওরা কোথায় থাকে!

—তুই মনে করে দ্যাখ, গত শীতকালে কাউকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখেছিস?

আমি মনে করার চেষ্টা করলুম। ঠিক মনে পড়ল না। তবে মনে হচ্ছে যেন শীতকালের রাত্রে ফাঁকাই থাকে, ফুটপাথে কোনো বাধা থাকে না। যাক, ওকথা ভাবতে ভালো লাগছে না এখন।

বন্ধুটি তবু চিড়বিড় করতে লাগল, এ তো বেশ একটা ধাধা দেখছি। শুনেছি, কলকাতা শহরে অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোকের কোনো ঘর-বাড়ি নেই, তারা স্রেফ রাস্তায় শোয়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে শীতকালে কোথায় ঘর-বাড়ি পায়। শীতকালে কোথায় উপে যায়? এ তো একটা বিরাট ধাধা দেখছি।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, এর মধ্যে ধাধার কি আছে? এরা গরমকালে রাস্তায় শোয়, আবার পরের গরমে রাস্তায় শোবে, মাঝখানের শীতকালটা শুধু অদৃশ্য হয়ে থাকে। আমাদের বাড়ির মাঠের আগাছাগুলো শীতকালে সব মরে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আবার পরের বর্ষায় দেখি মাঠভর্তি আগাছা! আগাছার তো আর কেউ চাষ করে না। আসলে আগের বছরের আগাছাগুলোই পরের বছর আবার ফিরে আসে। মাঝখানের সময়টা অদৃশ্য থাকে।

বন্ধুটি একটু গোঁড়া ধরনের—হাসি ঠাট্টা বিশেষ পছন্দ করে না, সে বলল, গাছগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় না, ওদের বীজ লুকোনো থাকে মাটিতে, পরের বছর আবার তাই থেকে গাছ হয়।

আমি তখনো হাসি বজায় রেখে বললুম, তা হলে এ লোকগুলোও রাস্তায় বীজ রেখে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে।

—তুই যে কতদূর নির্বোধ, তুই যখন বেশি কথা বলিস তখনই বেশি করে বোঝা যায়।

—এ কথাটা তোর পছন্দ হলো না? আচ্ছা, তা হলে যাযাবর পাখির মতন ওরা কোনো গরম গনগনে দেশে চলে যায়, এই সময়।

—কোথায়?

—আমি কি জানি! তাহলে তুই-ই বল, ওরা কোথায় যায়?

—আমি জানি না বলেই তোকে জিজ্ঞেস করছিলুম।

—তাহলে যে-জিনিসটা আমিও জানি না, তুইও জানিস না, তা নিয়ে আলোচনা করার দরকার কি? একেই বলে কাকদন্ত গবেষণা। কে কোথায় শোয়

তা নিয়ে ভেবে আমাদের সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

শীতকাল হচ্ছে আনন্দের সময়, এই শীতে আমরা আনন্দ করব। চল, এই শীতে পুরী বেড়াতে যাবি?

২৩

বেচু রক্ষিত নামে একজন লোক কেষ্টনগর থেকে কলকাতায় আসছিলেন তাঁর ভগ্নীপতির বাড়িতে। ট্রেনে ওঠবার আগে চার টাকার সরপুরিয়া-সরভাজা কিনে নিয়েছেন। দিদি জামাইবাবুর জন্য কলকাতায় তখন দুধ-ক্ষীরের জিনিসপত্র পাওয়া যায় না, তাই কেষ্টনগরের নামকরা মিষ্টি নিয়ে চলেছেন ওদের খুশি করতে।

ব্যাপারটার শুরু এইখান থেকে। বেচু রক্ষিত মিষ্টির হাঁড়িটা বাঙ্কের ওপর সুটকেশ-বিছানার পাশে লুকিয়ে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুম দিয়েছেন। এক ঘুমে কলকাতা। শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেই ধড়মড় করে উঠে প্রথমেই তিনি খোঁজ নিয়েছেন মিষ্টির হাঁড়ির। না, কেউ চুরি করেনি, কেউ খোলেও নি! কিন্তু হাঁড়িটার ওপর দুটো নীল রঙের ডুমো-ডুমো মাছি বসে আছে। ওরা সেই কেষ্টনগর থেকেই হাঁড়ির মধ্যে রসের খোঁজ পেয়ে হাঁড়ির গায়ে লেগে আছে। বিরক্ত হয়ে বেচু রক্ষিত হাতের ঝাপটায় মাছি দুটোকে তাড়িয়ে বললেন, যাঃ যাঃ! মাছি দুটো একটু ভন ভন করে উড়ল আশপাশে, তার পর হাতের ঝাপটার ভয়ে দূরে দূরে রইল।

গাড়ি থেকে নেমে, কাঁখালে সতরঞ্চি মোড়া বেডিং, বাঁ-হাতে টিনের সুটকেশ ও ডানহাতে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে বেচু রক্ষিত শেয়ালদা স্টেশন থেকে এবং আমাদের এই কাহিনী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কেষ্টনগরের সেই নীল ডুমো মাছি দুটো ভনভন করে ওড়াউড়ি শুরু করে পরস্পরকে বলল, এ আবার কোথায় এলুম রে? চল, ভালো করে আগে জায়গাটা দেখে নেওয়া যাক। এই বলে, হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে তারা বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে গেল। মাছি দুটি যুবক-যুবতী। যুবক মাছিটি একটু চালিয়াৎ গোছের, সে বলল, বুঝেছি, এ জায়গাটার নাম নবদ্বীপ। যুবতী মাছিনী বলল, কি করে বুঝলে?

—একবার নবদ্বীপের এক মাছিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সে বলেছিল, ওঃ, নবদ্বীপে একেবারে...

—বুঝেছি, সেই যে মাছিনীটাকে পেয়ে তুমি আমাকে ছেড়ে কয়েকদিন...

—আর তুমি বুঝি তখন...

—থাক, আর ভ্যানভ্যান করতে হবে না।

যাই হোক, ওরা দুজনে উঁচু থেকে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেই বুঝে ফেলল, ওরা কলকাতা শহরে এসেছে। কেষ্টনগরের আসল দুধ-ক্ষীর খাওয়া মাছি তো, বুদ্ধি বেশ পরিষ্কার। কলকাতা শহরকে চিনতে পেরে ওরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। মাছি মাছিনীকে বলল, আর ঝগড়া করিসনি। আজ জীবনটা সার্থক হলো। কলকাতা শহরের কত নাম শুনেছি, কোনোদিন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলুম। এখানে আসতে পারব? কেষ্টনগরের মিষ্টি খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে, এখানে ওসব মিষ্টি-ফিষ্টির পাট নেই, এখানে খুব ভালো ভালো নোংরা, আস্তাকুঁড় আর জঞ্জাল আছে।

মাছিনী বলল, দ্যাখো না নীচে, কত মাছি গিসগিস করছে। কত দেশ থেকে মাছি আসে এখানে—দ্যাখো, রাস্তাঘাট একেবারে ভরা।

কিন্তু নীচে নেমে এসে দেখল, একটাও মাছি নেই, সব মানুষ। মাছি দুটো খুব মুস্কিলে পড়ল, সারা শহরে আর একটাও মাছি নেই, এমনকি মশা কিংবা পিঁপড়ে—এই সব ছোট জাতের প্রাণীও নেই। সব মানুষ। কলকাতার আকাশে মাত্র এই দুটো মাছি, অনেক লোক ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটা বাচ্ছা ছেলে বলল, বাবা ও দুটো কি চড়ুই পাখির বাচ্চা?

বাবা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, না, ওদের বলে মাছি। মফঃস্বল থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে বোধহয়। এই নিয়ে কাগজে একটা চিঠি লিখতে হবে তো।

সব কটা রাস্তা ধপধপে ঝকঝকে, কোথাও একছিটে ময়লা নেই, কোথাও জঞ্জাল জমে নেই, মাছি দুটো পড়ল মহা মুস্কিলে। ঝাড়ুদারেরা অনবরত রাস্তা সাফ করছে, ধুয়ে দিচ্ছে; নোংরা জমাবার কোনো সুযোগই নেই। এ কি আর কেষ্টনগর, ময়রার দোকানের ভাঙা ভাঁড়গুলোতে যা রস জমে থাকে তাতেই কত মাছির সংসার চলে যায়। ঝাড়ুদাররা দিনে মাত্র দুবার ঝাঁট দেয় কি না-দেয়। আর এ কলকাতা শহর, এখানে প্রত্যেক দোকানে কাচের বাক্স দিয়ে জিনিসপত্র ঢাকা, প্রত্যেক বাড়ির লোকেরা মুখ বন্ধ টিনের বাক্সের মধ্যে ময়লা জমা রাখে, মেথররা অনবরত এসে সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে যাচ্ছে।

মাছি মাছিনীকে বলল, শেষকালে কি এখানে এসে না খেয়ে মরব নাকি?

মাছিনী বলল, চলো না, মাছের বাজারে যাই, সেখানে তো মাছের কানকো নাড়িভুঁড়ি ফেলবেই?

ঘুরতে ঘুরতে এল মাছের বাজারে। মাছের বাজার ধোয়া সাফ, কিছু নেই, খুব সকালবেলা দু'চার রকম মাছ নাকি ওঠে, দেখতে দেখতে সেগুলা সাফ হয়ে যায়, অনেক লোক মাছের চুবড়ি পোওয়া জলও কেনে পয়সা দিয়ে—সুতরাং একটু বেলা হলে মাছের বাজারে আঁশটে গন্ধটুকুও থাকে না। এখন মাছওলা আর মেছুনী

বসে বসে কীর্তন গাইছে খোল করতাল বাজিয়ে। নিরাশ মাছিনী সঙ্গী মাছিকে বলল, এ কোথায় এলুম গো! এ কি শহরের ছিরি? একটুও নোংরা নেই—একে শহর না বলে তো মরুভূমি বললেই হয়। আম-জামের সময় হলে রাস্তায় অন্তত দু'একটা আমের খোসা ঠিকই পড়ে থাকত।

খিদে পেয়ে মাছির শরীর দুর্বল হয়ে গেছে, তার গলার আওয়াজ ভনভনের বদলে পিনপিন, সে বলল, এ শহরকে কিছু বিশ্বাস নাই। তাও হয়তো সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে ফেলে। আমের সময় না হোক, কলার তো সময়! রাস্তায় একটাও কলার খোসা দেখলি?

—সত্যিই! এ শহরের লোকেরা কলা খায় না নাকি?

—খাবে না কেন? বোধহয় খোসাশুদ্ধ খায়।

—মাছিদের জন্য একটু দয়ামায়াও নেই?

ঘুরতে ঘুরতে এল একটা বিরাট বাড়ির সামনে, যাকে বলে রাইটার্স বিল্ডিং! মাছি মাছিনী একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে, ভালো ভালো ময়লার বদলে ওরা এখন থুত্-কফ খেতেও রাজি। সেখানে গিয়েও ওরা অবাক।

মাছ মাছিনীকে বলল, হ্যাঁরে, কলকাতার বদলে কি আমরা ভুল করে বিলেতে চলে এলুম? মাছিনী বলল, সত্যি, মানুষগুলো এমন নিষ্ঠুরও হয়।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কোথাও একছিটে ময়লা নেই, দেয়ালে পানের পিক নেই, সিঁড়ির পাশে সিক্রি নেই, আলুর দমের ঝোল মাখানো একটি শালপাতাও নেই পর্যন্ত। ঝকঝকে তকতকে সব কিছু, লোকগুলো নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে উঠে থুত্টুকু ফেলার জন্য বারান্দায় গিয়ে থুক না করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকেছে, আবার বেরিয়ে এসে সযত্নে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এরা কি মানুষ? মানুষ এমন হৃদয়হীন হয়?

মাছি বলল, চল, এখানকার মানুষেরা কিছুতেই ময়লা থাকতে দেবে না, বুঝেছি। দেখি কোথায় এমন জায়গা আছে কি না—যেখানে মানুষ নেই, সেখানে যদি আপনি আপনি ময়লা-টয়লা কিছু থাকে।

কিন্তু কলকাতার লোক এমন বোকা নয় যে, ফাঁকা জায়গা রাখতে দেবে। কোথায় মানুষ নেই? মাঝে মাঝে পার্ক-ময়দান—তাও মানুষ দখল করে রেখেছে, সব জায়গা মানুষ বসে বসে পাহারা দিচ্ছে, যাতে কেউ কিছু নোংরা না করে ফেলে।

নাঃ, মাছি দুটো ভাবল, মানুষকে আর বিশ্বাস নেই। এবার জন্তু-জানোয়ারের খোঁজ করা যাক। হ্যাঁরে, এ শহরে কি বেড়ালছানা মরে না? কুকুর গাড়ি চাপা পড়ে না? তাদের মরা দেহগুলো কোথায় যায়? রাস্তায় একটাও তো নেই! মোষের গাড়ির মোষের কাঁধে ঘা পর্যন্ত নেই, ব্যাপার কি? মাছি মাছিনীকে বললে, বুঝলি,

এ সবই আমাদের না খাইয়ে মারার ষড়যন্ত্র!

মাছিনী বলল, চল, প্রাণ থাকতে এ শহর থেকে পালাই! আমাদের কেষ্টনগর এর থেকে ঢের ভালো ছিল।

—এই জন্যই এ শহরে মিষ্টি বন্ধ করেছে, বুঝলি! যাতে আর কোনো জায়গা থেকে মাছি না আসে! মিষ্টির গন্ধ পেলে দেশ-বিদেশ থেকে মাছি তো আসতই!

—মিষ্টি কে চাইছে? একটু পচা জঞ্জালও রাখতে নেই আমাদের জন্য?

চারপাশের এত বড়ো বড়ো বাড়ি, মাঝখানে একটু ফাঁকা মতন জায়গা। ভালো করে ওরা লক্ষ করে দেখল, ঠিক ফাঁকা নয়, ছোট ছোট ঘরের মতন। মাছিনী আহ্লাদে বলল, চল, ঐখানে যাই, ঐ ছোট ছোট ঘরগুলো নিশ্চয়ই মানুষের নয়, ওখানে জন্তুরা থাকে। জন্তুরা তো নিজেদের ময়লা লুকোতে পারবে না।

ওপর থেকে ওরা নীচে নেমে এল আবার। কোথায় জন্তু জানোয়ার? একটা বস্তি—এখানেও মানুষ। আর কি আদর্শ বস্তির আদর্শ মানুষ। পরিষ্কার নিকানো ঘরগুলো, অনেক ঘরের সামনে আবার আল্পনা দেওয়া, পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া, নর্দমা দিয়ে যে জল বইছে, তা পর্যন্ত পরিষ্কার। ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত নাকের সিক্নি ফেলে রাস্তা নোংরা করার বদলে নিজের সিক্নি নিজেই খেয়ে ফেলছে।

—মাছিনী, আজ আর বাঁচার আশা নেই।

—এই নাকি কলকাতা? এ শহরের এত নাম-ডাক? দূর দূর।

—গুজব! মাছি-সমাজ যে বলে কলকাতা একেবারে স্বর্গের মতন, যেখানে সেখানে ময়লা-নোংরা ছড়ানো—এবার বুঝলি তো, সব গুজব। কলকাতা না দেখেই কলকাতা সম্বন্ধে যত গল্প! বিলেত না গিয়েই বিলেত-ফেরৎ।

বিকেলের দিকে মাছি দুটো একেবারে করপোরেশনের অফিসে গিয়ে উপস্থিত। স্বয়ং নগরপালের ঘরে গিয়ে তার নাকের সামনে ভনভন করতে লাগল। নগরপাল আৎকে উঠে বললেন, কি? আমার শহরে মাছি? তাজ্জব কাণ্ড। কে কোথায় আছিস?

একদল লোক ছুটে এল, সবাই মিলে তাড়া করতে লাগল, মাছি দুটোকে। কোথা থেকে দুটো উটকো মাছি শহরে ঢুকে পড়েছে, এই নিয়ে কলকাতার নামে কলঙ্ক রটে যাবে। কাল না এ খবর কাগজে বেরিয়ে যায়। মারো মারো!

মাছি দুটো কিন্তু ভয় পেয়ে বেরিয়ে গেল না। নগরপালের কাছাকাছি উড়তে লাগল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ওরা একেবারে মুমূর্ষ, সারাদিন কোথাও একটু বসারও জায়গা পায়নি, গায়ের সেই চিক্কণ নীল রং মলিন হয়ে গেছে, গলার আওয়াজ প্রায় শোনাই যায় না, ওরা মরিয়া হয়ে নগরপালের মুখের সামনে ঘুরে ঘুরে কাতরভাবে অভিযোগ জানাতে লাগল, অন্যায়। এ আপনার অন্যায়, বিদেশ-বিভূঁই থেকে দু-

একটা পোকা মাছি এখানে বেড়াতে এলে—তাদের জন্য আপনি কোনো ব্যবস্থাই রাখেননি ? শহরে কোনো একটা জায়গায় অন্তত একটুখানি ময়লা তাদের জন্য রাখা উচিত ছিল! সারা শহর ঘুরে দেখলুম, কোথাও এক ছিটেও ময়লা নেই। এ আপনার অন্যায় নয় ? আমাদের মেরে ফেলতে চান ? এ রকম করলে কলকাতায় বেড়াতে আসব কি করে, অ্যাঁ ? আমরা আর কতখানি খাব, অন্তত এক রত্তি ময়লাও যদি রাখতেন—

২৪

মাঝে মাঝে মনে হয় না, কেউ বুঝি নাম ধরে ডেকে উঠল ? খুব ভিড়ের রাস্তা, ট্রাম-বাস বিক্সা-লোকজন, এই সব মিলিয়ে একটা শব্দ, এবং এই শব্দকে ছাড়িয়েও আর একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ডেকে ওঠে আপনার নাম, আপনার নাম যাই হোক না, শ্যামল বা শ্যামলী, অরুণ বা অরুণা, মাধব বা মাধবী, চিন্ময় বা চিন্ময়ী। কখনো এমন শোনেননি, খুব হনহন করে হেঁটে যাবার সময়, অন্যমনস্ক, এমন সময় আপনার নাম ধরে সেই তীক্ষ্ণ ডাক ? আমি শুনেছি অনেকবার, থমকে দাঁড়িয়ে উদভ্রান্ত মুখে তাকিয়ে এধার-ও ধার দেখেছি, কেউ না, কেউ আমায় ডাকেনি, সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত।

কখনো কখনো দেখেছি, সত্যিই কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। কাছেই একজন মানুষ ব্যাকুলভাবে ডাকছে, নীলু! নীলু! লোকটি অচেনা কিন্তু আমার আমেদাবাদের কাকা, ছেলেবেলার জ্যেঠামশাই, বিলেত-ফেরৎ মামা, কারখানার মজুর পিসতুতো ভাইরাও তো আমার অচেনা, সুতরাং আমি হতচকিতভাবে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, কী ? আমায় খুঁজছেন ? লোকটি ভ্রুক্ষেপও করে না, তাকায় না পর্যন্ত আমার দিকে, তবু ডাকতে থাকে, নীলু! নীলু! তখন দেখতে পাই দূর থেকে আমার সম্পূর্ণ বিপরীত চেহারার একটি লোক—নীলু নাম যাকে একেবারেই মানায় না—হাসতে হাসতে আসছে। তারপর ওরা আমাকে অগ্রাহ্য করে, কাঁধ ধরাধরি করে চলে যায়। আমার কী দোষ ?

বাস ধরার জন্য ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন একজন প্রৌঢ়। কোনো কথা না বলে অতিশয় পরিচিত ভঙ্গিতে দু-হাত তুলে নমস্কার করলেন। লোকটিকে বিন্দুমাত্র চিনি না, আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও তৎক্ষণাৎ দুহাত তুলে ওঁকেও প্রতি-নমস্কার করলুম। লোকটি নমস্কার শেষ করে তখন আমার

দিকে কটমট করে তাকিয়েছেন। আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর চলে যেতে যেতে বললেন, অসভ্য! ধর্মশিষ্টাচার একেবারে দেশ থেকে লোপ পেতে বসেছে!

লোকটি কি পাগল? কি দোষ করলুম আমি?

ঘাড় ঘুরিয়ে কারণটা বুঝতে পারলুম। আমার পিছনেই একটা ছোট কালীমন্দির। লোকটি আমায় নমস্কার করেনি, মূর্তিকে প্রণাম করেছেন। মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। আমি লোকটিকে না-হয় না-জেনেই, প্রতি-নমস্কার করলুম, সেটা হয়ে গেল অশিষ্টাচার? ঐ পাথরের মূর্তি কোনোদিন ওকে প্রতি-নমস্কার করবে?

এই রকম অনবরতই ভুল ডাক আর ভুল মানুষের সঙ্গে দেখা হয়।

সন্ধের শো-তে সিনেমা দেখব, বন্ধুর জন্য দাঁড়িয়েছিলাম একটা বিদেশী ছবির হলের সামনে। টিকিট নিয়ে দাড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ, বন্ধুর দেখা নেই, শেষ ঘন্টা পড়ে গেল, সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল, শুধু আমি আর ও-পাশে একটি মেয়ে দাড়িয়ে। মেয়েটির মুখ-চোখে অস্থিরতা, ওরও বন্ধু আসেনি? আমার বন্ধুও আসেনি। ওর বন্ধুও আসেনি।

সন্ধে গাঢ় হয়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি যেন ক্রমশ করুণ হয়ে আসতে লাগল। আমার কাছে তো দুটো টিকিট, এমনকি হয় না, আমরা দুজনেই একসঙ্গে সন্ধেটা কাটালুম সিনেমা দেখে? দুজনের সাময়িক শূন্যতা যদি সাময়িকভাবে ভরানো যায়? এই রকম বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটা বিখ্যাত গল্প আছে। আমি মনকে বললুম সাবধান! গল্প কখনো অনুসরণ করতে গেলে মেলে না। জীবন অনুযায়ী গল্প হয়, কিন্তু গল্প অনুযায়ী জীবন হয় না আর।

তবু একটা কৌতূহল ছুঁক ছুঁক করছিল। দেখাই যাক না, হয়তো অন্যরকম একটা গল্পও হয়ে যেতে পারে। আমি মেয়েটির দিকে তাকালুম, রাস্তার ধারের দিকে অল্প ছায়ার মধ্যে দাড়িয়ে, চোখ দুটি যেন ব্যাকুল হয়ে ঘুরছে চারদিকে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই, গল্পের নায়কদের মতন আমি অমন সহজে অচেনা মেয়ের সঙ্গে যে কথাই বলতে পারি না।

এখনো সময় আছে, এখনো ইচ্ছে করলে ইন্টারভেলের আগে ঢুকে পড়ে ফিল্মটা দেখা যায়। আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠে, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আলতোভাবে হাসলম। হাসিটা অনেকটা সেই কালীমূর্তিকে নমস্কার করার মতন। মেয়েটির দিকে চেয়ে হেসেছি বলা যায়, অথবা মেয়েটিকে ছাড়িয়ে পিছনের রাস্তায় এই মাত্র যে লোকটি পা পিছলে পড়ে গেল, তাকে দেখেও হেসে থাকতে পারি। উত্তরে, আমার হাসির চেয়েও একটু বড়ো আকারেব হাসি হাসল মেয়েটি। আমি

আগেই দেখে নিয়েছি, আমার পিছনে দেয়াল ছাড়া কিছু নেই। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সন্ধেবেলায় একা মেয়ে হাসবে কেন?

তবু আমি কথা বলার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। একটু দাঁড়িয়ে রইলুম। একবার মনে হলো, মেয়েটির হাসিটা কি বিদ্রূপের? মেয়েটি আবার অল্প হাসির আভাস দিল, এ হাসি যেন দুঃখের! তখনই আমার মনে হলো টিকিট বিক্রি করা কিংবা একা সিনেমা দেখা বা রাগ করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার চেয়ে, এই দুজনে একসঙ্গে সিনেমা দেখাই তো সবচেয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক। আমি মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম এবং নির্ভীক ও জড়তাবিহীন স্বরে বললুম, আপনারও... আসেনি বুঝি?

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে আবার হাসল। এবার হাসিতে দুঃখ নেই। আমি বললুম, দেখুন, আমার কাছে দুটো টিকিট আছে, আপনি দেখবেন? মেয়েটি এবার ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, কত দেবেন?

আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। শুনেছিলাম যেন, ও বলল, কত নেবেন? ভেবেছিলাম, আরেঃ! ও কি ভাবছে, আমি টিকিট নিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট করছি? সুতরাং ব্যস্ত হয়ে বললুম, না, না, আপনাকে দাম দিতে হবে না। এমনিই আমার সঙ্গে যদি আপনার সিনেমা দেখতে আপত্তি না থাকে— তবে, একসঙ্গে—

—কত দেবেন? আগে থেকে কথা হয়ে যাক্!

আমি এবারও বুঝতে পারিনি। অবাক হয়ে বললাম, কতোয় দেব? না, না. আপনাকে দাম দিতে হবে না।

মেয়েটির গলা এবার চাপা ও কর্কশ। তীব্র ভাবে বলল, ন্যাকা নাকি? বিনে পয়সায় পিরীত? শুধু বায়স্কোপ দেখিয়েই...আমি সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরে বিস্বাদ মুখে চকিতে দূরে গেলাম। ভয়ে ফিরে তাকাইনি। হলো না, একটা গল্প পর্যন্ত হলো না! এ তো সাধারণ ঘটনা। ভুল দুজনের দেখা হয়ে গেল আবার।

এই রকম ভুল দেখা যে কতবার অসংখ্যবার হয় আমার। শুধু আমিই ভুল করি না, অন্যরাও ভুল করে। রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছি, পিছন থেকে আচমকা কাঁধের ওপর বিরাট চাপড় দিয়ে একজন বলল, কী রে হরিপদ! আমি মুখ ফেরাতেই লোকটা দায়সারা গোছের ভাব করে বলল, ও, বুঝতে পারিনি মাপ করবেন! আমি অত্যন্ত চটে গিয়ে বললুম, আপনার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই! ঐ রকম বিচ্ছিরি নাম আমার হতে পরে? লোকটি লজ্জিত না হয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, হরিপদকে দেখতে আপনার চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর।

আমি বললুম, চুলোয় যাক। সুন্দর হোক বা কুচ্ছিৎ হোক. আমি হরিপদ নই, হরিপদ হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, আপনি না দেখে শুনে আমাকে অত

জোরে মারলেন কেন? লোকটি আমার মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়ে বলল, অত তেজ দেখাচ্ছেন কি? ভদ্রতা জানেন না—

যেন হরিপদ না হওয়াটা আমারই দোষ! হরিপদ না হবার জন্য আমাকে এবার মার খেতে হবে। ওঃ!

রাস্তার মোড়ে একদিন সকালবেলা দেখি খুব ভিড়, দু-তিনটে পুলিশের গাড়ি! নাক ভর্তি কৌতূহল নিয়ে আমি ভিড়ের মধ্যে নাক গলালুম। একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দুটো কুকুর। শুনলুম, রোমহর্ষক কাণ্ড। সামনের বাড়িতে গত রাত্রে জোড়া খুন হয়ে গেছে। অপরাধীকে ধরা যায়নি, কিন্তু অপরাধীর এক পাটি জুতো পাওয়া গেছে। ঐ পুলিশ কুকুর লাকি-মিতাকে জুতোর গন্ধ শুকিয়ে আসামীর সন্ধানে ছোটানো হবে।

শুনেই আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলুম। তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করে আমি একটি চলন্ত বাসে উঠে পড়লুম। বলা যায় না, আমার যা ভুলের ভাগ্য কুকুর দুটো ফস করে এসে হয়তো আমাকেই ধরত!

২৫

শুনেছিলুম, তিনি ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছেই কোথাও থাকেন। ঠিক বাড়ির নম্বরটা জানি না। বাড়ি নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।

বছর তিনেক আগে এক দুপুরবেলা আমি ট্রাম থেকে ঠনঠনের সামনে নেমে পড়েছিলাম। একটু ভয় ভয় করছিল, কি জানি কেমন লোক, আমি বিরক্ত করতে এসেছি বলে যদি ধমকে ওঠেন। যাই হোক, আজ দেখা না করে আর ফিরছি না।

কালীবাড়ির রকে একজন লোক বসে আছে, এমন চেহারা যে বয়েস বোঝার কোনো উপায় নেই। লোকটির মুখে কাঁচা-পাকা মুড়ি-মিছরি ধবনের দাড়ি—কিন্তু মাথার চুল কুচকুচে কালো। আমি একটুক্ষণ পাশে দাড়িয়ে থেকে তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এ পাড়ায় শিবরাম চক্রবর্তী কোথায় থাকেন, বলতে পারেন?

লোকটি প্রথমেই আমার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করল। হয়তো আমার লেখা উচিত ছিল, 'করলেন', কিন্তু লোকটির ব্যবহার এমন যাচ্ছেতাই যে এসব লোককে কিছুতেই আপনি বলা যায় না। ওরকম কুটিলভাবে আমার পা-থেকে মাথা পর্যন্ত দেখার দরকারটা কি? লোকটির গলার আওয়াজ কাক ডাকার মতন, জিজ্ঞেস করল, কে থাকে? কি নাম?

আমি সম্ভ্রমপূর্ণ গলায় পুনরায় বললুম, আজ্ঞে, শিবরাম চক্রবর্তী। দয়া করে যদি—

—বাড়ির নম্বর কত?

—আজ্ঞে, বাড়ির ঠিকানাটা ঠিক জানি না। সেই জন্যই তো—

—বাড়ির ঠিকানা জান না, কলকাতা শহরে লোক খুঁজতে এসেছ? কে পাঠিয়েছে তোমায়?

—কেউ না। উনি বিখ্যাত লোক, তাই আমি ভেবেছিলাম—

লোকটি হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বিখ্যাত লোক এপাড়ায়?

তারপর সে ঠোঁট দুটি পুরো ফাঁক করল। অর্থাৎ হাসি। বললে, এ পাড়ায় বিখ্যাত লোক দুজনই আছে, আমি আর কাশীরাম ভটচার্যি। আমায় তো চেনোই দেখছি, কাশীরাম ভটচার্যির নাম শুনেছ? প্রখ্যাত জ্যোতিষী, সম্পর্কে আমার আপন ভগ্নিপোত, তুমি বোধহয় তাকেই—

আমি বললুম, আমি আপনার ভগ্নীপতির কখনো নাম শুনিনি বটে, কিন্তু উনি নিশ্চয়ই খুব বিখ্যাত। তবে আমি ওনাকে খুঁজতে আসিনি। আমি খুঁজছি শিবরাম চক্রবর্তীকে।

—তবে যে বললে বিখ্যাত লোককে খুঁজছ? সে লোকটা কিসে বিখ্যাত?

—উনি একজন লেখক। আমাদের শ্রদ্ধেয়—

—লেখক! কি লেখে?

—প্রধানত হাসির গল্পই লেখেন। তা ছাড়া, আগে—

—হাসির গল্প? চালাকি পেয়েছ?

লোকটি এবার বেশ ক্রুদ্ধ। সোজা হয়ে বসে বলল, হাসির গল্পে আবার লেখার কি আছে হে? ওসব মানুষে লেখে? হে-হে-হে-হে, যত ইচ্ছে হাসো না, যখন খুশি, এর মধ্যে আবার লেখাপড়াব কথা কি? লেখে লোকে ধম্মোকম্মো, সদা সত্য কথা বলিবে, কি করে স্বাস্থ্য ভালো বাখতে হয়—এইসব নিয়ে। তুমি এসেছ হাসির গল্পো চালাতে? আমার সঙ্গে ফাজলামি-এয়ার্কি?

ইতিমধ্যে তিন-চারজন কৌতূহলী লোক জমে গেছে। একজন জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? পকেটমার না জুতোচোর? আজকাল কালীবাড়িতে এমন জুতোচোরের উপদ্রব হয়েছে। আরেকজন বলল, পকেটমার নয় তো?

মূল লোকটি খেঁকিয়ে উঠে বলল, ছোকরাকে দেখছি তখন থেকে এখানে ঘুরঘুর করছে। বাবুরাম চক্রবর্তী না কাকে খোঁজার ছুতো—

আমি ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম, বাবুরাম না, শিবরাম।

—ও নামে কেউ এ পাড়ায় থাকে? আপনারাই বলুন। আমি তিরিশ বছর এ-পাড়ায় আছি, আমি জানি না।

জনতা বলল, ঐ তো কাশীরামবাবু আসছেন, ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না!

বেশ টের পেলুম, লোকে আমায় ঘিরে ধরেছে। দৌড়ে পালাতে গেলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা। কাশীরামবাবুর চেহারা রোগা-চিমশে ধরনের, কপালে ফোঁটা-তিলক। দেখে আরো ভয় হলো। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, খুব বেশি রোগা লোকেরা কিছুতেই সরল কথা বোঝে না। সব সময়েই তাদের জেরা করার টেণ্ডেন্সি। ইনিও এসে বৃত্তান্ত শুনে সহাস্যে বললেন, আগে বলো তো বাপু, এ-পাড়ার সেই লোকটির সঙ্গে তোমার কি দরকার?

সর্বনাশ, এ কথা আগে তো একবারও ভাবিনি। দরকার তো কিছু নেই! আমি আমতা আমতা করে বললুম, না, মানে, শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে—

জনতা গর্জন করে উঠল, অ্যাঁ, দেখতে? একজন জলজ্যান্ত মানুষকে শুধু চোখের দেখা দেখতে? স্পাই। স্পাই!

কাশীরামবাবুই দয়ালুভাবে বললেন, আহা-হা, আগেই মারধোর শুরু করো না! আগে দেখা যাক, সত্যিই ও নামের কোনো লোক এ পাড়ায় থাকে কিনা! যদি এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যে কোথাও সে থাকে, আমি গুণে বলে দেব!

ফতুয়ার পকেট থেকে খড়ি বার করে তিনি মাটিতে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগলেন। গোটাকয়েক চৌখুপ্পি আর ঢ্যাড়া। চক্রবর্তী তা হলে তোমার হলো গিয়ে অমুক গোত্র, নামের প্রথমে যদি তালব্য শ থাকে—। আমি তখন দরজা জানালা বন্ধ ঘরের মধ্যে বেড়ালের মতন আটকে পড়েছি। ভাবছি এবার আঁচড়ানো কামড়ানো শুরু করব কি না, নাকি কেঁদে কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি দেব।

খানিক বাদে চোখ খুলে কাশীরাম জ্যোতিষার্ণব বললেন—তেমনি হাসি হাসি মুখে, নাঃ, ও নামে কোনো লোক থাকতে পারে না। সর্বৈব বাজে কথা। এ পাড়ায় কেন, কোথাও নেই।

আমি বললুম, তা হলে মন্টুর মাস্টার কিংবা বাড়ি থেকে পালিয়ে—এগুলো কে লিখেছে? নাকি আপনি বলতে চান, এরকম কোনো বইও নেই?

এমন সময় একটি শৌখিন চেহারার যুবা, ফর্সা, সুদর্শন, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, ধপধপে আদ্দির পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম—ভিড়ের মধ্যে থেকে এসে আলতোভাবে আমার কাঁধ ছুঁয়ে বললে, আহা, ওকে ছেড়ে দিন! ও আমাকে খুঁজছে।

আমার চেয়েও কাশীরামের বিস্ময় বেশি। হাঁ করে তাকিয়ে বললেন, আপনিই? তা চক্রবর্তী আপনার উপাধি না খেতাব? রাঢ়ী না বারেন্দ্র? খড়দা

মেল না ফুললে মেল ? ওঃ! তাই বলুন, এই জন্য আমার গণনা একটুর জন্য মেলেনি!

বলেই কাশীরাম ভিড়ের মধ্যে সুট করে মিশে গেলেন। যুবকটি আমার হাত ধরে ফাঁকায় নিয়ে এসে সস্নেহে বললেন, এবার বলো!—আমার বুকের ধড়ফড় তখনো কমেনি। ঢোক গিয়ে বললাম, আপনাব এত বয়স কম ? আমি ভেবেছিলাম একবারে অন্যরকম!

যুবকটি বললেন,

অন্যরকম অন্য-বেশি
বেশির কম, কমবয়েসি।

বুঝলে ?

অথবা বলতে পার, বয়সের ভয়েসে কখনো বেশি Boyish, কখনো বায়সের মতন Raw, কখনো ভঁইসের মতন...

আমি বললুম, সত্যিই যদি আপনার কম বয়স হয়, তবে আমাকে 'তুমি' বলবেন না। আমিও রোজ রোজ দাড়ি কামাই।

—রোজ রেজারে দাড়ি কামাও ? না, দাড়ি কামিয়ে রোজের রুজি রোজগার করো ? তোমার চেহারাখানা তো দেখলে মনে হয়, চেয়ার-হারা, দাঁড়িযে দাড়ি কামানোই...

—একটু আস্তে আস্তে বলুন না, আমি লিখে নিই। অত তাড়াতাড়ি বলছেন, একটু মাঝে মাঝে দাঁড়ি কমাও না বসালে—

—বেশ, বেশ, শিখে গেছো দেখছি। তোমারও হবে। চালিয়ে যাও। পেছন থেকে রুক্ষ গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, এই পল্টু। পল্টু!

এক ঝলক তাকিয়ে দেখি একজন বেঁটে কালো গুণ্ডা চেহাবার লোক আমাদেরই দিকে তাকিয়ে ডাকছেন। যুবক শিবরাম চক্রবর্তীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার নাম যে পল্টু নয়, সেটা অন্তত আমি ভালো রকমই জানি। আবার পল্টু পল্টু ডাক শুনে আমি ওঁকে বললুম, আপনাকে ডাকছেন বোধহয়। আপনার ডাকনাম পল্টু বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তা হলে আপনি শিবরাম নন। শিবরামের ডাক নাম কখনো পল্টু হতে পারে না!

পিছন থেকে সেই লোকটি এসে বলল, ও বুঝি তোমায় বলেছে ও শিবরাম। ব্যাটা মহা জোচ্চোর! শিবরাম হচ্ছি আসলে আমি। আমার নাম শিবরাম সেন। —একথা বলেই লোকটার কি হাসি।

আমি বললুম, কিন্তু আমি তো শিবরাম চক্রবর্তীকে খুঁজছি। সেন তো না!

—ঐ হলো। আমিই আস্তে আস্তে চক্রবর্তী হয়ে উঠব। শুনবে? আমি মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বাড়ির তক্তায় শুয়ে শুক্তো খাই। স্ত্রীকে দিয়ে জামাটা ইস্তিরি করিয়ে নিয়ে মিস্তিরি খুঁজতে যাচ্ছিলুম এমন সময়ে চটির সঙ্গে চটাচটি হয়ে—

প্রাগুক্ত যুবক বললেন, ধুৎ। বাজে! ওসব মুখস্থ। কেন ছেলেটাকে শুধু শুধু ঠকাচ্ছো? আমার মতন বানান নিয়ে বানানোর ক্ষমতা আছে তোমার? এসো না কমপিটিশান হয়ে যাক্।

—কমপিটিশানে কে জাজ হবে?

—কেন, এই ছেলেটি!

—উঃ, ও যদি কারুকে কম পিটি, কারুকে বেশি পিটি করে?

—আচ্ছা ঐ তো বড়দা আসছেন, বড়দাকে জাজ করা যাক।

একজন সৌম্য চেহারার প্রৌঢ় আসছিলেন। বিশাল দেহ, মাথাভর্তি চকচকে টাক, সোনার চশমা, গরদের পাঞ্জাবি, হাতে ছড়ি। মনে হয় কোনো রিটায়ার-করা জমিদার বিকালের ভ্রমণে বেরিয়েছেন। লোক দুটো ওঁর কাছে গিয়ে বললে, বড়দা আপনি বিচার করে বলুন তো, আমাদের মধ্যে কে সত্যিকারের শিবরাম?

প্রশস্ত হাস্যে সেই প্রৌঢ় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে দেখে খুশি হলাম। পাঠকদের দেখা পাওয়াই তো আমাদের সৌভাগ্য! তুমি পাঠক আর এ দুটো হচ্ছে ঠক! এই দুটোর কথায় কোনো কান দিও না। ওরা হচ্ছে রাম শিব, আমিই হচ্ছি আসল শিবরাম। শিবরামের Soul—আর কারুর কথায় বিশ্বাস করো না, আমার কোনো ব্রাঞ্চ অফিস নেই।

লোক দুটোর একজন বলল, ইঃ, শোল না শুকতলা? আরেকজন বলল, বড়দা, একি হচ্ছে? এ আপনার অন্যায়!

রহস্যময়ভাবে প্রৌঢ় বললেন, আমিই যে আসল শিবরাম, তোরা এতদিন জানতে পেরেছিলি? অবশ্য, এখন আমি প্রমাণ দিতে গেলে তোদের কাছে হেরেও যেতে পারি। জানিস তো, বার্নার্ড শ-এর মতো গদ্য কে লিখতে পারে এই নিয়ে একবার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। স্বয়ং বার্নার্ড শ-ও তাতে ছদ্মনামে লেখা পাঠিয়ে পেয়েছিলেন মোটে তৃতীয় পুরস্কার। তেমনি, তোদের কাছে আমি হেরে গেলেও—

যুবাটি বলল, আপনার চালের ব্যাবসা, আপনি লাকি ম্যান, তা বলে চালাকি করছেন এখানে? আপনি যদি শিবরাম চক্রবর্তী হন তো, আপনার চুল কোথায়? শৈল চক্রবর্তীর সব ছবিতে আছে, কপালের কাছে এক গোছা চুল এসে পড়েছে, এই দেখুন না, আমার মতন—

প্রৌঢ় হঠাৎ চুপসে গিয়ে বললেন, ওসব আগেকার ছবি। আগে যখন আমার চুল ছিল—

—বাজে কথা! কুড়ি বছর ধরে আপনাকে দেখেছি এইরকম গোল আলু মতন মাথা, জন্মো থেকে আপনার টাকালু!

এর পর সেই তিনজন লোক শিবরামত্ব নিয়ে মহা ঝগড়া আরম্ভ করে দিল। আমি কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর দৌড়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লুম।

শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে তারপরও আমার কোনোদিন দেখা হয়নি। দেখা হবেও না জানি। আমার ধারণা শিবরাম চক্রবর্তী নামে কোনো লোক নেই। শিবরাম চক্রবর্তী আসলে অনেকগুলো লোক। কিংবা সব মানুষেরই মনের মধ্যে যে একটি করে ছেলেমানুষ লুকিয়ে থাকে—তারই সার্বজনীন নাম শিবরাম চক্রবর্তী।

২৬

আমি ভেবেছিলাম এসব গল্পগুলো আর আজকাল সত্যি হয় না। সেই যে, বৃদ্ধ ভদ্রলোক সারা জীবন কাজ করার পর রিটায়ার করে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কিংবা গ্র্যাচুইটির টাকা নিয়ে ফিরছেন, বাড়ি পৌঁছবার আগেই সব টাকাটা পকেটমার হয়ে গেল। সারা জীবনের সঞ্চয় শেষ করে সামনে শুধু ধূ ধূ শূন্যতা। শুধু গল্পে নয়, খবরের কাগজে এ-রকম খবর পড়েছি যে, মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে যথাসর্বস্ব টাকা তুলে নিয়ে ফিরছেন কোনো স্নেহময় পিতা, মাঝপথে গুণ্ডারা ছিনিয়ে নিয়ে গেল সব টাকা। হয়তো তখন সানাইয়ের অর্ডার পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে, বর্ষীয়সী মহিলারা পিঁড়িতে আলপনা দেওয়া শেষ করেছেন, নিমন্ত্রণের চিঠি সব বিলি করা হয়েছে, জামাইয়ের জুতোর মাপ পর্যন্ত নেওয়া বাকি নেই, এমন সময় সেই আসন্ন উৎসব-বাড়িতে শ্মশানযাত্রীর মতো ফিরে এলেন হৃতসর্বস্ব মেয়ের বাবা। এসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

শুধু গল্পে নয়, খবরের কাগজেও এ রকম খবর পড়েছি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, এখন আর এসব হয় না। এখন টাকার দাম একদল মানুষের কাছে খোলামকুচি হলেও আরেক দলের কাছে—যাদের হারায়—একেবারে বুকের মণি। এখন প্রাণ হারায় কিন্তু টাকা হারায় না আর।

আমার প্রতিবেশী অপূর্ববাবুর স্ত্রী সন্ধেবেলা নিজের ষোলো বছরের মেয়ে আর তিনটি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে জামাকাপড় কিনতে বেরিয়েছিলেন। অপূর্ববাবু লোকটি একটু অলস প্রকৃতির এবং অলস লোকদের যা প্রধান বিলাসিতা—উনি প্রায়ই আমার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তর্ক করতে আসেন। কথায় কথায় প্রায়ই

বলেন, আমি যদি মুখ্যমন্ত্রী হতাম, তা হলে এদেশের—ইত্যাদি। ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমার হাই ওঠে, বিছানায় এলিয়ে পড়ি, তবু যে ওকে চলে যেতে বলতে পারি না, তার কারণ শুধুই আমার ভদ্রতাবোধ নয়, অপূর্ববাবু লোকটি নিরীহ এবং সরল এবং অসৎ নন—এবং শুধু এই কটা গুণই আজকাল এমন দুর্লভ যে, এই রকম কোনো মানুষ দেখলে তার অন্যান্য দোষ ক্ষমা করা যায়।

রাত দশটার সময় অপূর্ববাবুর বিধবা বোন এসে বললেন, হ্যাঁরে, বউমারা যে এখনো ফিরল না? একটু দ্যাখ—

অপূর্ববাবু আলস্যের ভঙ্গি করে বললেন, যাবে আর কোথায়? মেয়েছেলেদের কেনাকাটা কি আর সহজে শেষ হয়।

—কিন্তু ছ'টার সময় বেরিয়েছে, এখন দশটা বাজল।

—পঞ্চাশটা দোকানে ঘুরবে, তবে তো কিনবে? ওই জন্যই তো আমি সঙ্গে যাই না!

এগারোটা বাজল, তখনো অপূর্ববাবুর স্ত্রীর দেখা নেই। শহরের এই উপকণ্ঠে এগারোটা অনেক রাত, শেষ বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আমিই বললুম, মশাই, একটু খোঁজখবর করুন, এত রাত হয়ে গেল। অপূর্ববাবু হাসতে হাসতে বললেন, কোথায় খোঁজ করব বলুন? কোন দোকানে গেছে, আমি কি আর জানি? বোধহয় আজ একটু ট্যাকসি করে আসার শখ হয়েছে।

সাড়ে এগারোটা আন্দাজ অপূর্ববাবুর চেহারা কিন্তু একেবারে বদলে গেল। অলস লোকদের যা স্বভাব, হঠাৎ এক সময় অতি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। চোখ-মুখ শুকনো করে অপূর্ববাবু বললেন, কী সর্বনাশের কথা বলুন তো! এখন আমি কি করি? কলকাতা শহর চোর-গুণ্ডায় ঠাসা, ওর কাছে যে আমার যথাসর্বস্ব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, যথাসর্বস্ব মানে কত টাকা? অপূর্ববাবু একটি আধা-সরকারি অফিসে সামান্য চাকরি করেন। বোনাস নেই, ঘুষ নেই, শুধু মাইনের টাকা। পুজোর বাজারের ভিড় এড়াবার জন্য আগেই অফিস থেকে এক মাসের বেসিক পে ১৮০ টাকা এনেছেন, সেই সঙ্গে যাবতীয় গুপ্ত সঞ্চয় যোগ করে ওঁর স্ত্রী ২৪০ টাকা নিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছেন।

আমি বললাম, রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না তো?

—না, আমার মেয়ে সঙ্গে আছে, সে রোজ কলেজ যায়, সে সব রাস্তা চেনে। এখন আমি কি করি? থানায় যাব? হাসপাতাল—

অপূর্ববাবু খুবই অসহায় হয়ে পড়েছেন দেখে আমি বললুম, চলুন, বেরিয়ে দেখা যাক।

শহরের উপকণ্ঠের মহিলাদের কোনো বিশেষ জিনিসপত্র কেনার সময়

শহরের হৃৎপিণ্ডের প্রধান দোকানগুলোতে যাবার ঝোঁক হয়। অবশ্য নিউ মার্কেট পর্যন্ত যাবার দৌড় ওদের নেই। সুতরাং কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে অনুমান করা যায়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

বেশি খুঁজতে হলো না। রাত বারোটায় রাস্তাঘাট নিঝুম হয়ে গেছে, দোকানপাট বন্ধ। কলেজ স্ট্রিট বাজারের কাছে একটা জায়গায় খুব ভিড়। ট্যাকসি থেকে নেমে উঁকি দিতেই দেখতে পাওয়া গেল একটা বন্ধ কাপড়ের দোকানের সিঁড়িতে অপূর্ববাবুর স্ত্রী অনড় হয়ে বসে আছেন, চোখে দৃষ্টি শূন্য, বাচ্চা ছেলেগুলো কান্নাকাটি জুড়েছে, ষোল বছরের মেয়েটি মাকে জড়িয়ে ধরে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ভিড়ের মুখে মুখে প্রচুর সমবেদনা ও কৌতূহল।

ঘটনাটা জানতে পারা গেল। বেশ কয়েকটা দোকান ঘুরে এক দোকানে সব পছন্দ হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে বসে, অপূর্ববাবুর স্ত্রী একে একে পছন্দ করেছেন, ওঁর বিবাহিত মেয়ে-জামাইয়ের জন্য শাড়ি আর পাঞ্জাবি, কুমারী মেয়েটির জন্য একটা হাল ফ্যাশনের শাড়ি (এইটাই সবচেয়ে দামী), বিধবা ননদের জন্য থান, বাচ্চাদের প্যান্ট-শার্ট, স্বামীর জন্য তাঁতের ধুতি। নিজের জন্য কিছু আর টাকায় কুলোয়নি যদিও। দাম দেবার সময় দেখলেন, পাশে ওঁর হাত-ব্যাগটা নেই। নেই? নেই! নেই! নেই!

আর সব আছে, দোকানের ঝলমলে আলো, রং-বেরঙের শাড়ির বাহার, অসংখ্য ক্রেতার মুখের হাসি-খুশি, সবই ঠিকঠাক আছে, শুধু নেই অপূর্ববাবুর স্ত্রীর হাত-ব্যাগ। একটা কালো ধুমসো মতো লোক গা ঘেঁষে ছিল না? সেও নেই। সে কি কোনো জিনিস কিনেছে? কেনেনি। সে শুধু চুরি করতেই এসেছিল।

গোলাপী-রাঙা শাড়িখানা মেয়ের গায়ের ওপর মেলে ধরে উজ্জ্বল মুখে বলেছিলেন, হ্যাঁরে খুকি, এই রংটা তোকে খুব মানিয়েছে। মানাবে না, দামও তো কম নয়! ছেলেদের পোশাকে লেগেছিল ওঁর স্নেহ-মাখানো হাত, স্বামীর ধুতির ওপর দৃষ্টি পড়েছিল চাপা প্রেমের, ননদের থানের গায় লেগেছিল ভক্তি—সবগুলোই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল—সেগুলো সবই আবার ফিরে গেল গাদার মধ্যে। অপূর্ববাবুর স্ত্রী দোকানের মধ্যে পাথরের মতন বসে রইলেন।

দোকানের কর্মচারীরা একেবারে নৃশংস নয়। তাদেরও প্রায় চোখে জল এসেছিল, এমনকি তারা কাপড়গুলো সব ধারেও দিতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু তিনি আর একটিও কথা বলেননি। দোকান বন্ধ না করলে পুলিশে ধরে, তাই ওরা বাধ্য হয়েই ওকে জোর করে বার করে দিয়েছে। সিঁড়িতে সেই থেকে বসে আছেন অপূর্ববাবুর স্ত্রী।

অপূর্ববাবু ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়ে বললেন, ওগো শুনছ? শুনছ? কী

সর্বনাশ। তুমি ওরকম করে বসে আছ কেন? টাকা গেছে গেছে, তুমি বাড়ি চলো! ওঁর স্ত্রী একবার চোখ তুলে তাকালেন। তারপর ঢলে পড়ে গেলেন অজ্ঞান হয়ে।

২৪০ টাকা কি আর এমন, একে যথাসর্বস্ব বলা যায় না। অপূর্ববাবুর স্ত্রী দু-একদিন বাদেই আঘাত সামলে উঠলেন। অপূর্ববাবুর কি আর এমন ক্ষতি হলো? এতে উনি ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়েও মরবেন না, বা জামাকাপড়ের অভাবে একেবারে উলঙ্গ হয়েও থাকতে হবে না। কি আর হবে, বেঁচে ঠিকই থাকবেন। বড়োজোর, পুজোর মধ্যে ওর ছেলেমেয়েরা নতুন জামা না পরার লজ্জায় বাড়ি থেকে বেরুবে না। অপূর্ববাবুর মামার বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়—সেখানে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া হবে না। ওঁর বিধবা দিদি কপাল চাপড়ে বলবে, আমার ভাগ্যটাই চিরকাল এমন—। বেশি কিছু ক্ষতি নয়, বেঁচে ঠিকই থাকবেন। যা হারালেন, তা হলো আনন্দ, পুজোর কয়েকটা দিনের আনন্দ হারালেন।

যে-লোকটা টাকা চুরি করল, সে ২৪০ টাকায় কি পাবে? বেশি কিছু না, খানিকটা আনন্দ। অপূর্ববাবুর পরিবারের আনন্দ চুরি করে সে নিজে আনন্দ করবে। ওই দীর্ঘশ্বাস-মিশ্রিত টাকা নিয়ে লোকটা হয়তো মদ-টদ খাবে, জুয়া খেলবে, স্ত্রীলোক নিয়ে ফুর্তি করবে। খানিকটা আনন্দ। যারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা চুরি করে, তাদের মতোই, ওই লোকটাও ভোগ করবে আনন্দ—খানিকটা শান্তিহীন, রুক্ষ আনন্দ।

২৭

চৌবাচ্চার জলের প্যাঁচটা খারাপ হয়ে গেছে, যতই ঘোরাই কিছুতে বন্ধ হয় না। চৌবাচ্চা ভর্তি হয়ে জল ছাপিয়ে উঠছে, বাথরুম ভেসে যাচ্ছে জলে। অনেক টানাটানি ধাক্কাধাক্কি করেও কলটা বন্ধ করতে না পেরে আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম। বিরক্তির পর দুঃখবোধ।

অত জল উপচে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। জলের অপচয় দেখে সত্যি কষ্ট হয়। নদীনালার দেশের ছেলে, বালক বয়েস থেকে একটা জিনিসই অপর্যাপ্ত দেখছি, তা হচ্ছে জল। আজ সেই জলের অপব্যয় দেখে মন খারাপ লাগছে ভেবেও আরেকবার মন খারাপ হলো। ভাঙা, নষ্ট করা, ছড়ানো-ছেটানো, অপব্যয়—এগুলো মানুষের আদি স্বভাব। এখন কিছুই আর অপব্যয় করার মতন বেশি নেই, জলও বেশি নষ্ট করতে কষ্ট হয়।

কষ্ট হচ্ছিল, কারণ বারবার বিহারের খরা অঞ্চলের কথা মনে পড়ছিল। সেখানে একে খাদ্যাভাব, তার ওপর জলের অভাব, পুকুর কুয়ো টিউবওয়েল শুকিয়ে এসেছে—হাজার গ্রামে মানুষের স্নান-কাপড় কাচা তো দূরের কথা, খাবার জল খাচ্ছে মেপে মেপে। যাদের বাড়িতে কুয়ো এখনো শুকোয়নি, তারা লাঠিসোটা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে—যেন অন্য কেউ এসে জল না চুরি করে। জয়প্রকাশ নারায়ণ আপ্রাণ ছোটাছুটি করছেন নতুন গভীর কূপ খোঁড়ার টাকা সংগ্রহের জন্য।

কিন্তু এখানে বসে আমি মন খারাপ করেই বা কি করব। আমার বাড়িতে জল চৌবাচ্চা ছাপিয়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, আর বিহারের লোকেরা তৃষ্ণার্ত—কিন্তু তা বলে তো আমার বাড়ির জল বিহারে পাঠানো সম্ভব নয়। সুতরাং বাথরুমের জল নষ্ট হতে দিয়েই আমি ঘরে ফিরে এলুম। দেখা যাক, এরপর কতদিনে কলের মিস্ত্রির খোঁজ পাওয়া যায়।

ঘরে ফিরে এসে, কাগজ ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ মনে হলো, কলকাতা থেকে জল পাঠাতে পারি না ঠিকই, কিন্তু কুয়ো খোঁড়ার জন্য কিছু টাকা পাঠাতে পারি অনায়াসেই। সেটা করলেও অনেকটা গ্লানিমুক্ত হওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পকেটে হাত দিলুম।

কিন্তু মহৎ কাজে সব সময়ই অনেক বাধা। পকেটে কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছুই নেই। দেরাজ-টেরাজ ঘাঁটাঘাঁটি করলুম, সেখানেও কিছু নেই। কিছু টাকা ধার করলে হয় কিন্তু ধার চাইব ভেবে যে-বন্ধুর কথাই ভাবি—অমনি শিউরে উঠি, সকলের কাছেই 'কাল ফেরৎ দেব' বলে বহু টাকা ধার হয়ে আছে। তাদের সঙ্গে দেখা করাই বিপজ্জনক। ইস, কোনো একটা ভালো কাজের কথা মাথায় এলেই—হাজার রকমের বাধা আসে। এই সময় কী আমার অনেক টাকা থাকা উচিত ছিল না?

কোনো ব্যাপারে হতাশা এলেই আমার চেয়ার ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। আর, শুয়ে পড়লেই আমার মাথায় নানা রকম পরিকল্পনা আসে। শুয়ে শুয়ে ভাবলুম, একা সামান্য কিছু টাকা না-পাঠিয়ে—কয়েক জনের কাছ থেকে কিছু চাঁদা তুলে এক সঙ্গে টাকা পাঠালে কেমন হয়? কয়েক জনের নাম ভাবলুম —যাদের কাছে চাঁদা চাওয়া যায়। তারপরই মনে হলো চাঁদা যখন চাওয়াই হচ্ছে তখন ব্যাপারটা আরো বড়ো করা যেতে পারে।

মাথায় পরিকল্পনা এল, বাংলাদেশের লেখকদের পক্ষ থেকে যতদূর সম্ভব টাকা তুলে বিহারে পাঠানো যেতে পারে—সেই টাকায় যদি একটি বা দুটি কুয়োও খোঁড়া হয়, তাও যথেষ্ট। কী-রকম ভাবে চাদা চাইব সঙ্গে সঙ্গে ভেবে ফেললুম। খবরের কাগজে আবেদন জানানো, বাংলা দেশের সমস্ত লেখকদের কোনো একটা

জায়গায় মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাতে। আর একটা দিনে মিটিং ডাকা হবে—সে মিটিং কোনো ভাড়া-করা হলঘরে কিংবা ময়দানে নয়, কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগরের মূর্তির কাছে এক বিকেলবেলা সেখানে জমায়েত হবেন সব লেখকরা, তারপর সবাই মিলে গান গাইতে গাইতে ঘুরব কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়—ওখানেই তো সমস্ত বইয়ের দোকান আর প্রকাশভবন, ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সব দোকানে দোকানে ঘুরে টাকা চাওয়া হবে, তারপর জমা-করা সব টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে জয়প্রকাশ নারায়ণকে।

নিজের পরিকল্পনায় নিজেই উৎফুল্ল হয়ে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে বাইরে এলাম। চমৎকার পরিকল্পনা, লেখকরা নিশ্চয়ই রাজি হবেন, হবেন না? বাংলা দেশের লেখকরা খুবই অনুভূতিপরায়ণ, তাঁরা ভিয়েৎনামের যুদ্ধের প্রতিবাদেও মিটিং করেন, চাঁদা তোলেন, আর প্রতিবেশী বিহারের ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত লোকদের জন্য অনুভব করবেন না? তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম।

প্রথমেই একজন পরিচিত লেখকের সঙ্গে দেখা। তাঁকে সোৎসাহে আমার পরিকল্পনা ব্যক্ত করলুম। তিনি মুখ শুকনো করে বললেন, ব্যাপারটা তো খুবই ভালো, কিন্তু তুমি খবর্দার ওসবের মধ্যে যেও না।

জিজ্ঞেস করলুম—কেন?

—তুমি মানিঅর্ডারে টাকা পাঠাতে বলবে, চাঁদা তুলবে—এর জন্য হয়তো পুলিশ তোমাকে টানাটানি করবে। তা যদি নাও করে, অনেকে নিশ্চিত বলবে, তুমি ওর থেকে কিছু টাকা চুরি করেছ, বলবেই। যে-কোনো চাঁদা তোলার ব্যাপারে একজন-না-একজন চোর হয়ই লোকের কাছে। তুমি ঐ বদনাম নিতে যাবে কেন? তোমাকে বন্ধুভাবে বলছি, তুমি ওসবের মধ্যে যেও না। অন্য কেউ ইচ্ছে হয় করুক।

শুনে আমি কিছুটা বিচলিত বোধ করলেও নিরস্ত হলুম না। ভাবলুম, তিনি আমাকে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে নিরাশ করার চেষ্টা করছেন। সুতরাং, আর-একজন অল্প চেনা লেখককে পথে দেখতে পেয়ে সব খুলে বললুম। তিনি মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। তারপর চোখ সরু করে বললেন, কি ব্যাপার?

আমি অবাক হয়ে বললুম, মানে, বিহারের দুর্দশার কথা নিশ্চয়ই কাগজে পড়েছেন—

তিনি বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু হঠাৎ আর্ত নিপীড়িত জনগণের দুঃখে তোমার প্রাণ যে কেঁদে উঠল! কী ব্যাপার?

—আজ্ঞে না, প্রাণ ঠিক কাঁদেনি। এমনই সাধারণ দায়িত্ববোধ।

—বুঝেছি! এই ফাঁকে নিজে নাম করে নিতে চাও। কাগজে নাম বেরুবে সেই লোভ! লেখকদের সমাবেশ হবে সেই লোভে। লেখকদের সমাবেশ হবে—সেটা তুমি অর্গানাইজ করবে কেন? লেখকদের দলে ভিড়ে তুমিও লেখক হতে

চাও, না? তুমি কি লেখ? ঐ সব টুকরো-টুকরো আজেবাজে লিখলেই লেখক হওয়া যায়, অ্যাঁ? খুব লেখক হবার শখ!

এসব একেবারে আঁতে ঘা দিয়ে কথা। এবার আমি সত্যিই নিরাশ হয়ে পড়লুম। ইচ্ছে হলো, তক্ষুনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। যত রাগ হলো আমার বাড়ির চৌবাচ্চার কলটার ওপর। ওটা খারাপ হয়েছিল বলেই তো এসব ঝঞ্ঝাটের কথা মনে পড়ল।

সন্ধেবেলা আরেকজন পরিচিত লেখকের সঙ্গে দেখা। তিনি নিজে থেকেই সহৃদয়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে মুখ শুকনো কেন? মন খারাপ নাকি? কেন?

আমি উত্তর দিতে পারলুম না, চুপ করে রইলুম। কারণ, তখন সত্যিই আমি বুঝতে পারছিলুম না, আমার মন খারাপের আসল কারণ কি সত্যিই বিহারের খরা-পীড়িত লোকদের দুর্দশা, না আমার পরিকল্পনা সার্থক হলো না, সেই জন্য। হয়তো সত্যিই নিজের নাম জাহির করার উদ্দেশ্যই আমার ছিল।

কিন্তু সেই তৃতীয় লেখকটি প্রশ্ন করে সব কথা শুনলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, এই ব্যাপার? আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে।

তিনি সোজা আমাকে নিয়ে এলেন গঙ্গার পাড়ে। অন্ধকার হয়ে এসেছে, গঙ্গায় চকচক করছে জল, চারপাশে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা। আমি বললুম, এখানে নিয়ে এলেন কেন?

—ঐ নদীর দিকে একটু তাকিয়ে থাকো, মন ভালো হবে। তারপর তোমাকে আর-একটা জিনিস দেখাব।

—মন ভালো হবার দরকার নেই। সেই আরেকটা জিনিসই দেখান।

গঙ্গার পাড় ধরেই কিছুদূর হেঁটে এলাম। এক জায়গায় প্রায় শ-দুয়েক নারী-পুরুষ গোল হয়ে ঘিরে বসে গান করছে। তিনি বললেন, গান শুনবে? ওদের গান শোনো—বেশ গায় ওরা—!

আমি যথেষ্ট বিস্মিত হয়ে বললুম, এই গান শোনাতে এত দূর নিয়ে এলেন? আপনি যে এতবড়ো সঙ্গীত রসিক, তাও তো জানতুম না!

—শুনে দেখোই না ওদের গান! বেশ লাগবে।...ওসব জিনিস সংগঠন করা সবার কাজ নয়। তোমার আমার কাজ নয় চাঁদা তোলা। লোকের কথা গায় মাখলে কি আর পাবলিক ওয়ার্ক করা যায়? ও চেষ্টা করাই তোমার ভুল হয়েছে। তার চেয়ে এদের দ্যাখো। আমি কাল হঠাৎ এসে ওদের দেখেছি এখানে—

—ওরা কারা?

—তুমি যাদের কথা ভাবছিলে—বিহারের খরা অঞ্চলের লোক।

—তাই নাকি? আপনি কি করে জানলেন?

—আমি কাল ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। দ্বারভাঙ্গা জেলার একটি গ্রামের প্রায় সব কজন লোকই খাদ্য পানীয় না-পেয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে।

আমি লোকগুলোর দিকে এবার তাকিয়ে দেখলুম। শিশু-বৃদ্ধ নারী-পুরুষ মিলিয়ে একটা গোটা গ্রামের সব লোক—দেখলে মনে হয় চাষী শ্রেণী। সারাদিন ওরা ভিক্ষে করে, রাত কাটায় গঙ্গার ধারে—পারিবারিক বন্ধন থেকে সবকিছুই এখানে বজায় আছে। মাঝখানে কয়েকটা বিরাট বিরাট মাটির হাঁড়িতে খিচুড়ি ফুটছে, আর ওরা নিশ্চিন্ত ভাবে গান গাইছে। কলকাতা শহর ওদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিয়েছে।

একবার চড়াৎ করে মনে পড়ল, ইস, এই সব লোকই এসে কলকাতার ভিড় বাড়াচ্ছে, কলকাতাকে নোংরা করছে—কোনো মানে হয় না। পরক্ষণেই ভাবলুম, কী স্বার্থপর আমি! একটু আগে বিহারের আর্তদের দুঃখে অভিভূত হয়েছিলুম, এখন তাদেরই একদল কলকাতায় আশ্রয় পেয়েছে বলে খুশি হতে পারছি না! তারপর ও চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে, ওদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করলুম।

সরল, এক-রঙা সব লোক, দেহাতি ভাষার সব কথা বুঝতে পারি না। এটুকু বুঝলুম, ওরা কখনো আগে ভিক্ষা করেনি, এবার আর উপায় ছিল না। গ্রামকে গ্রাম শুকিয়ে মরতে হতো, তাই দল বেঁধে চলে এসেছে কলকাতায়। সারাদিন ভিক্ষে করার পর এখানে এসে আবার জড়ো হয়, ভিক্ষের চাল একসঙ্গে করে খিচুড়ি ফোটায়, তারপর একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া সেরে এখানেই গঙ্গার ধারে ঘুমিয়ে পড়ে। বৃষ্টিপাত শুরু হলে আবার ফিরে যাবে নিজের গ্রামে।

বেশ খিচুড়ির গন্ধ বেরিয়েছে, ছাপ ছাপ কাপড়-পরা দুটো জোয়ান চেহারার যুবতী মেয়ে কাঠের টুকরো দিয়ে হাতা বানিয়ে খিচুড়ি ঘুটছে। সেই রান্নার গন্ধে হঠাৎ আমার খিদে জেগে উঠল।

ওদের দলের এক বুড়ো আমাদের জিজ্ঞেস করল, বাবু, আপনারা ব্রাহ্মণ? আমরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে বুড়োটি অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, বাবু, আমাদের খাবার একটু প্রসাদ করবেন? দয়া করে যদি—

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, না না সেকি! বুড়োটি বলল, তারা সবাই নিচু জাত, গঙ্গা মাইজির পাড়ে বসে খাবার খেতে হলে প্রথমে ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ না করে তারা তো খেতে পারে না, তাহলে পরমাত্মা সন্তুষ্ট হবে না। সুতরাং আমরা যদি দয়া করে—

সঙ্গের লেখকটি বললেন, অত আপত্তি করছ কেন? রাজি হয়ে যাও না। গরম গরম খিচুড়ি মন্দ লাগবে না। খাওয়ার পর বোকার মতন তুমি আবার যেন ওদের পয়সা দিয়ে অপমান করতে যেও না।

গঙ্গাজল ছিটিয়ে শালপাতা বিছিয়ে আমাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া হলো।

ভক্তিভরে পরিবেশন করল মেয়েরা। পাঁচ রকমের চাল-ডাল, সেই সঙ্গে ভিক্ষে পাওয়া আলু বেগুন যা পেয়েছে—সবই সেদ্ধ দিয়েছে। অপূর্ব স্বাদ, অমন সুন্দর খিচুড়ি বহুদিন খাইনি। খুব তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে খেয়ে উঠলুম।

বিহারের খরাপীড়িত লোকদের সাহায্য করব ভেবেছিলুম, উল্টে তারাই আমার এক রাত্তিরের খাওয়া জুটিয়ে দিল।

২৮

নদী কোথা থেকে আসছে—এর উত্তর তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই জানি। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন, নদী আসে মহাদেবের জটা থেকে। কথাটা সত্যি কিনা মিলিয়ে দেখবার জন্য আমি নিজেও অনেক নদীর পাড়ে বসে জিজ্ঞেস করেছি, 'নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' কুলকুল কলধ্বনির মধ্যে আমিও সেই একই উত্তর শুনেছি, 'মহাদেবের জটা হইতে।'

নদীর পাড়ে বসে আমি আর একটি প্রশ্নও করেছি, যখনই যেখানে নদী দেখেছি, আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে সেই প্রশ্ন, নদী তুমি কোথায় যাচ্ছ?

এর উত্তর পেতে আমার দেরি হয়েছে। সকালে, সন্ধ্যায়, একা বা দলবলের সঙ্গে শহরে বা নির্জন প্রান্তরে যেখানেই আমি নদী দেখেছি, খুব গোপনভাবে জিজ্ঞেস করেছি, নদী তুমি কোথায় যাচ্ছ? কখনো এই উত্তর শুনিনি, 'সমুদ্রে'। না, নদী আমাকে কোনোদিন কুলুকুলু কলধ্বনির মধ্যে বলেনি, আমি সমুদ্রে যাচ্ছি। অথচ জানি তো, নদী সমুদ্রেই যায়, আর কোথাও তার যাবার উপায় নেই, তবু নদী কখনো নিজের মুখে সে-কথা বলে না।

মানুষও তো যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে, কিন্তু মানুষ কি সে-কথা বলে? রাস্তা দিয়ে একজন মানুষ হনহন করে হেঁটে চলেছে, যদি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করি, কি, কোথায় চলেছেন? তিনি কি উত্তর দেবেন, মৃত্যুর দিকে? অথচ, সেইটাই তো সত্যি উত্তর। কিন্তু কোথায় চলেছেন, একথা জিজ্ঞেস করলে, সব মানুষেরই অন্তর্নিহিত একটিই উত্তর: আর একজন মানুষকে খুঁজতে।

সবাই সারাজীবন আরেকজন মানুষকে খুঁজছে—সে খোঁজাই বোধহয় মৃত্যুর কথা মনে পড়ায় না।

নদীও যায় সমুদ্রের দিকে, কিন্তু সে-কথা বোধহয় তার মনে থাকে না, সেও বোধহয় আর একটি নদীকে খোঁজে। পৃথিবীতে এমন একটিও নদী আছে কি, যে পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে একা-একা সোজা গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে? ভূগোলে

এমন কথা কখনো পড়িনি। এরকম চিরকুমারী, ব্রহ্মচারিণী নদী বোধহয় পৃথিবীতে একটাও নেই। সব নদীই আর একটি নদীকে খোঁজে, সমুদ্রে যাবার আগে।

যাই হোক, নদী আর মানুষের জীবন নিয়ে এই খেলা আর সস্তা তুলনাটা বেশি টেনে লাভ নেই। মানুষের কথা থাক, আমি শুধু নদীর কথাই বলি।

জগদীশচন্দ্র নদীর ভাষা বুঝতেন, আমার তো সে ক্ষমতা নেই। আমি নদীর পাড়ে বসে জিজ্ঞেস করেছি, নদী, তুমি কোথায় যাচ্ছ ? নদীর জলে তখন অস্পষ্ট কোলাহল, তরঙ্গের বিভঙ্গ, যেন নদীর মধ্যে তখন খুব একটা হাসাহাসি পড়ে গেছে, পিকনিকে মেয়েদের মতন তবল ইয়ার্কিতে আসল কথা গোপন করার চেষ্টা। বুঝতে পেরেছি, নদী আমায় উত্তর জানাতে চায় না, কিন্তু তার ছটফটানি দেখলে বুঝতে পারা যায়, সে অন্য নদীকে খুঁজতে যাচ্ছে।

এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গম আমি বার ছয়েক দেখেছি, কলকাতার কাছেই ত্রিবেণীও আমার দেখা, আরো অনেক নদীর মিলনকেন্দ্র দেখার স্মৃতি আমার আছে, তবু, কোথাও কোনো নদী দেখলেই এখনো আমার মনে হয়—কোথায় সে অন্য নদীর সঙ্গে মিশেছে—একবার দেখে আসি। জগদীশচন্দ্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে গঙ্গোত্রীর অভিমুখে গিয়েছিলেন, আমিও একবার দুই নদীর মিলনকেন্দ্র আবিষ্কার করেছিলুম। জগদীশচন্দ্রের তুলনায় আমার প্রতিভা যত ছোট, ভাগীরথীর তুলনায় সেই নদীও তেমনি ছোট।

বোগা ছিরছিরে নদী, নাম হারাং। সাওতাল পরগণায় নামুচক গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। নদীর সাওতালি নাম হারাং, বাংলায় হারান বলতে ইচ্ছে হয় আমাদের, এমনই করুণ, অভিমানী, হারিয়ে যাবার মতন চেহারা তার। হারান নাম হলে অবশ্য আর নদী থাকে না, বলতে হয় নদ, কিন্তু নদ কথাটা আমার পছন্দ নয়, বিশ্রী শুনতে। মেয়ে-পুরুষ যাই হোক, সব নদীই নদী, যেমন সব পাখিই পাখি, পুরুষ পাখিদের তো আমরা পাখ বলি না।

সেই হারাং নদীর পাশে ডাকবাংলো, সেখানে কয়েক বছর আগে গিয়েছিলাম আমরা কয়েকজন শহুরে বাবু ও বিবি। আমাদের পরনে চোঙা প্যান্ট, হাতে ট্রানজিস্টার, মহিলা দু'জনের হ্রস্ব জামার ফাঁক দিয়ে বহু বাতাস ঢুকতে পারে —অর্থাৎ পোশাকের মধ্যে অনেক জানলা-দরজা, ঠোঁট ও পায়ের নখ লাল, অদূরে দাঁড়ানো জিপ গাড়ি। আমাদের সরু-মোটা গলা ও ট্রানজিস্টারের কর্কশ নিনাদে সেই নির্জন নদীতীর গমগমে হয়ে উঠেছিল, প্রতি সকালবেলা এক-চতুর্থ ডজন মুরগি কিনে এনে মহোল্লাসে হত্যা করা হচ্ছে, খোঁজ করা হচ্ছে মহুয়ার, হিন্দী ফিলমের নায়কের মতন প্যান্টের পা গুটিয়ে হাঁটুর কাছে তুলে আমরা যখন তখন নদী পেরিয়ে যাচ্ছি।

মহিলা দু'জন বলেছিলেন মাগো, কি বিশ্রী নদীটা, দেখলে বমি আসে! আর কোনো ডাকবাংলো পাওয়া গেল না?

সত্যি, সে নদী দেখে মুগ্ধ হওয়া যায় না। অনেক উদ্যোগ আয়োজন করে খাড়া পাড় বেশ নেমে গেছে বটে—কিন্তু পরিসর আট-দশ ফুট মাত্র এবং হরে-দরে হাঁটুজল। চারপাশে এবড়োখেবড়ো পাথর ছড়ানো, জলের রং অপরিষ্কার, যেন নদী নয়, জঙ্গলের খোলা ড্রেন।

সে নদীর একমাত্র গুণ, রাত্রিবেলা অস্পষ্ট আলোয় যখন চতুর্দিক ঝাপসা —তখন শুধু হারাং নদীর জল চকচক করে, শোনা যায় অস্পষ্ট ছলছল শব্দ। সেইটুকু মাত্র গুণের জন্যই আমরা সন্ধ্যাবেলা হারাং নদীর পাড়ে পাথরের চাঁই-এর ওপর বসতুম। খোলা গলায় বেসুরো গানের পরিহাস রসিকতা হতো। ওগো, নদী আপন বেগে পাগলপারা—এই গানও কেউ গেয়েছিল।

ডাকবাংলোর কীপারের নাম লেটু। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, লেটু, এ নদীটা কোথা থেকে আসছে রে?

লেটু কিছুটা অবাক হয়ে উত্তর দেয়, আসেনি তো। এ নদী তো এখানেই ছিল! ই হারাং নদী বটে!

শুনে আমাদের দলের কেউ কেউ হাসে। অনুমান করা যায়, হারাং নদী কাছেই কোনো পাহাড়ী জলপ্রপাত থেকে এসেছে। কিন্তু নদীটা গেছে কোনদিকে? সমুদ্রে নিশ্চয়ই নয়, এ নদীর চৌদ্দ পুরুষেও কেউ সাগর দর্শন করতে পারবে না। লেটুকে আবার জিজ্ঞেস করলুম, প্রশ্নটার গুরুত্ব আনবার জন্য হিন্দীতে, লেটু ই নদী ইধার কিৎনা দুরতক গিয়া? লেটু হিন্দী জানে না, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে, উও জঙ্গলের মধ্যে কুথাও হারিয়ে গিয়েছে হবেক।

এবারেও আমাদের দলের মধ্যে হাস্য। কেউ বললে, বুঝলি না, হারান-ই হচ্ছে নদীটার আসল নাম। জঙ্গলের মধ্যে কোথাও হঠাৎ শুকিয়ে গেছে—দূর, এ আবার নদী!

মুরগি বিক্রি করতে আসে ওসমান মিঞা, সে অনেক জানেশোনে, বুড়ো মানুষ—তার অনেক অভিজ্ঞতা, তাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, হয়তো। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে আমার ভরসা হয় না, আবিষ্কারের নেশায় আমায় পেয়ে বসে, মনে মনে সংকল্প করে ফেলি, নদীটা কোথায় গেছে দেখতে হবে। হঠাৎ নিশ্চয়ই শুকিয়ে যায়নি, যত ছোটই হোক, এরও তো জলে স্রোত আছে।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর কারুকে কিছু না বলে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। একটা গরাণ গাছের ডাল ভেঙে লাঠি বানিয়ে নিয়েছি, জুতো পরিনি, শুধু গেঞ্জি গায়ে—খাঁটি পর্যটকের চেহারা। কিছুটা যেতেই দেখতে পেলাম,

আমাদের দলের মহিলা দু'জনের অন্যতমা হারাং নদীর খাদে নেমে বনতুলসী কিংবা ঘেঁটু পুষ্পচয়নে ব্যস্ত। আমাকে দেখে মুখ তুলে বললেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললুম, এই একটু এদিক দিয়ে ঘুরে আসছি! শ্রীমতী বললেন, আমিও যাব। বললুম, না না তোমায় যেতে হবে না।

এ কথা বলেই ভুল করেছিলুম। কেন না, মেয়েদের কোনো জিনিস বারণ করলে তারা শোনে কখনো? সেটাতেই জেদ ধরে। সুতরাং তিনি বললেন, হ্যাঁ যাব।

আমি তবু বললুম, না, যেতে হবে না। ওরা বকাবকি করবে। তা ছাড়া আমার ফিরতে দেরি হবে।

শ্রীমতী বললেন, বেশ করব, যাব। তোমার সঙ্গে তো যাচ্ছি না, আমি আলাদা যাচ্ছি। অর্থাৎ তিনি রইলেন নদীর অন্যপাড়ে, সেই প্রাচীন রূপকথার নারী-পুরুষের মতন।

নদী কোথা থেকে আসছে—তা দেখার আমার কৌতূহল নেই; সুতরাং নদীর স্রোত যে দিকে আমরা সেই দিকে হাঁটছিলুম। ক্রমশ জঙ্গল একটু ঘন হলো নদীও একটু গভীর, নদীর পাড় দিয়ে রাস্তা নেই—এখন রুক্ষ পাথর ও আগাছার ঝোপ তা ছাড়া আর একটা অসুবিধে, গ্রাম-বালকরা তাদের সকালের কাজকর্ম নদীর ধারেই সেরে রেখে যায়—যে কোনো মুহূর্তে তাতে পা পড়ার সম্ভাবনা। ওপার থেকে শ্রীমতী চেঁচিয়ে বললেন, কি বিশ্রী জায়গা, আমার আর ভালো লাগছে না। আমি বললুম, কে তোমায় আসতে বলেছিল? শ্রীমতী রাগতভাবে বললেন, চলো, এবার ফিরে যাই। আমি বললুম, তুমি ফিরে যাও। আমি যাব না! শ্রীমতী এবার কাঁদো কাঁদো. এতটা চলে এসেছি. এখন আমি একলা ফিরব কি করে? আমি বললুম, তা হলে যা ইচ্ছে করো। শ্রীমতী এবার বললেন, নীলুদা, আপনি এরকম—

তখনো নদী তেমন চওড়া হয়নি, কিন্তু জল গভীর হতে শুরু করেছে। কিছু একটা দেখতে পাবার উত্তেজনা এসেছে আমার মধ্যে। আমি এগিয়ে চললুম।

শ্রীমতী একবার এপারে আসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জলে নেমে দেখলেন —শাড়ি অনেকখানি তুলতে হয়, সুতরাং নিবৃত্ত হয়ে অগত্যা আবার সামনের দিকে এগুতে লাগলেন। এবং অবলাসুলভ ক্রমে মিথ্যে অভিযোগ করে বললেন, তুমি শুধু শুধু আমায় এতদূর নিয়ে এসে এখন একা ছেড়ে দিতে চাও! বেশ জোরে হাওয়া বইছে, সুতরাং আমাকে চেঁচিয়ে ওপার থেকে বলতে হলো, কী মিথ্যেবাদী! মোটেই আমি তোমাকে আনিনি, আমি একা-একা আসছিলুম, তুমি তো জোর করে আমার সঙ্গে এলে! শ্রীমতী আরো রেগে গিয়ে বললেন, মোটেই না। আমিই তো একা ফুল তুলছিলাম। তুমিই তো দেখিয়ে দেখিয়ে আমার সামনে দিয়ে

আসছিলে—উদ্দেশ্য আমায় সঙ্গে ডাকা! আমি ঠোঁট উল্টে বললুম, বয়েই গেছে আমার তোমায় ডাকতে!

ক্রমে বেশ বেলা হয়ে এল, রোদ্দুর প্রগাঢ়। ইচ্ছে হয় গা থেকে গেঞ্জিটাও খুলে ফেলতে। কিন্তু ওপারে মাত্র তো কয়েক হাত দূরেই শ্রীমতী, সুতরাং খালি গা হওয়া যায় না। পথে একটা ছোট্ট গ্রাম পেরিয়ে এলুম, একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নেই—এমন ছোট্ট গ্রাম, শুধু হোগলা পাতার কয়েকখানা ঘর আর কিছু মুরগি-ছাগল ও উলঙ্গ শিশু। আবার জঙ্গল। দুপুরের কাছাকাছি আমি সেই অভীষ্ট অঞ্চলে পৌঁছুলাম।

লাট্টুর মতো দেখতে একটা ছোট্ট টিলা, ভেড়ার লোমের মতন তার গায় ছোট ছোট আশসেওড়ার জঙ্গল, তার মাঝখান দিয়ে বিনা নোটিশে নেমে এসেছে আর-একটা নদী, একটু পুরুষ ধরনের বলশালী নদী, পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে তার জলে সাদা ফেনা পর্যন্ত ওঠে। সেই নাম-না-জানা নদীতে মিশেছে আমাদের হারাং।

এখানেই হারাং-এর জন্ম সার্থক! হারাং যেখানে অন্য নদীতে মিশেছে—সেখানেও তারও জল স্বচ্ছ, তার জল দুলছে, ঘূর্ণীতে নেচে উঠছে—আনন্দে সেখানে সে আত্মহারা। যেন সেই জায়গাটা অবিকল একটা পেঙ্গুইন এডিশান প্রয়াগ-সঙ্গম, ঐ ছিরছিরে রোগা পটকা হারাং এখানে ঘূর্ণী ঘুরিয়ে নাচছে। আমি আবিষ্কারকের আনন্দে সেখানে দাড়িয়ে রইলাম।

শ্রীমতী বললেন, আমি ওপারে যাব, এখন তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ নেই, অনুনয়। আমি বললুম, চলে এসো! শ্রীমতী বললেন, পারছি না, তুমি এসো।

আমি পা ডুবিয়ে লাঠি বাড়িয়ে দেখলুম, জল বেশ গভীর, তাছাড়া স্রোতের টান খুব, পা স্থির রাখা যায় না। বললুম, উঁহু, যেতে পারছি না।

শ্রীমতী করুণ কণ্ঠে বললেন, আমার একা ভালো লাগছে না। না, তুমি এসো। যেমন করে হোক!

আমি বললুম, একা কোথায়। এই তো এদিকে আমি রয়েছি, কতটাই-বা দূর। শ্রীমতী তবু বললেন, না, তুমি এদিকে এসো। মাঝখানে নদীটা ভালো লাগছে না। আমি বললুম, তা হলে আগেই এলে না কেন? যখন জল কম ছিল?

শ্রীমতী বললেন, আগে ইচ্ছে করেনি কিন্তু এখন আমার একা ভালো লাগছে না।

শ্রীমতী তখন সেই দুই নদীর মেশার জায়গায় জলের ঘূর্ণী ও ঢেউ ভাঙার খেলার দিকে বিষণ্ণমুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।
